মাসিক
পৃথিবী
ইসলামী গবেষণা পত্রিকা

ডিসেম্বর ২০২৫
অগ্রহায়ণ-পৌষ ১৪৩২
জুমাদাল আখিরাহ-রজব ১৪৪৭
বর্ষ ৪৫
সংখ্যা ০৩

ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক : ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

সূচীপত্র

সম্পাদকীয় ॥ ৩

দারসুল কুরআন

হিদায়াত লাভের উপায়
প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ ॥ ৪

দারসুল হাদীস ॥

অর্থহীন বিষয়াবলী বর্জন : ইসলামের অপরূপ সৌন্দর্য
অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক ॥ ১৫

চিন্তাধারা

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ এবং জাতীয় সংহতি
আবুল আসাদ ॥ ২৫

মুসিলম উম্মাহর মৌলিক বৈশিষ্ট্য
ড. ইউসুফ আল কারযাভী ॥ ৩১

ইসলাম গণতন্ত্র ও নির্বাচন
ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী ॥ ৩৭

ইসলামের আলোকে সন্ত্রাস নির্মূলে রাষ্ট্রের করণীয়
ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম ॥ ৪৬

আন্তর্জাতিক

মামদানির বিজয় ॥ মীযানুল করিম ॥ ৫৬

প্রশ্নোত্তর ॥ ৬১

বই পরিচিতি : মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন ॥ ৬৪

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫-এর পক্ষে ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী কর্তৃক প্রকাশিত এবং আলফালাহ প্রিন্টিং প্রেস, ৪২৩ এলিফ্যান্ট রোড, বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭ থেকে মুদ্রিত।

যোগাযোগ :

সম্পাদকীয় বিভাগ : ২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড (৪র্থ তলা), ঢাকা-১২০৫

সেলস্ এন্ড সার্কুলেশান : কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস, ঢাকা-১০০০; ফোন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫, ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০, ফোন : ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯
Web : www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

ISSN : 1815-3925

মূল্য : পঞ্চাশ টাকা

মাসিক পৃথিবী'র নিয়মাবলী

১. এজেন্সী

- ✳ প্রতি কপি পত্রিকার গায়ের মূল্য ৫০ টাকা।
- ✳ সর্বনিম্ন পাঁচ কপির এজেন্সী দেয়া হয়।
- ✳ এজেন্সীর জন্য অগ্রিম টাকা দিতে হয়।
- ✳ কোনো জামানত রাখতে হয় না।
- ✳ অর্ডার পেলেই পত্রিকা ডাক ও কুরিয়ার যোগে পাঠানো হয়।
- ✳ যে কোন মাস থেকে পত্রিকার সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়।
- ✳ অবিক্রিত কপি ফেরত নেয়া হয় না।
- ✳ ৫ কপি থেকে ২৫ কপির জন্য ২৫% কমিশন দেয়া হয়।
- ✳ ২৬ কপি থেকে ১০০ কপির জন্য ৩০% কমিশন দেয়া হয়।

বিভিন্ন দেশে প্রতি কপি পত্রিকা পাঠানোর বার্ষিক ডাক খরচ

দেশের নাম	সাধারণ ডাক খরচ	রেজিঃ ডাক খরচ
✳ বাংলাদেশ	৭০০/-	৭০০/-
✳ ভারত, পাকিস্তান ও নেপাল	১৩৫০/-	১৬০০/-
✳ মধ্যপ্রাচ্য, এশিয়া	১৬০০/-	১৯০০/-
✳ আফ্রিকা, ইউরোপ	২৬০০/-	২৮০০/-
✳ আমেরিকা, ওশেনিয়া	২৮০০/-	২৯০০/-

২. টাকা পাঠানোর নিয়ম

- ✳ গ্রাহক হবার জন্য মানি অর্ডার/চেক/ব্যাংক ড্রাফট- 'মেসার্স পৃথিবী' হিসাব নং-১০৮৫ (২০৫০২১৫০২০০১০৮৫১০) এম.এস.এ, ইসলামী ব্যাংক, এলিফ্যান্ট রোড শাখা, ঢাকা এই নামে অগ্রিম পাঠাতে হয়।
- ✳ অথবা ০১৭৩২-৯৫৩৬৭০ নাম্বারে বিকাশ মার্চেন্ট পেমেন্ট করা যায়।
- ✳ পত্রিকা বৃদ্ধি করা/কমানো বা পত্রিকার বিল সংক্রান্ত যে কোন বিষয়ে যোগাযোগ করুন : ০১৫৭৫৬২২০৮৫

ম্যানেজার

সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশন বিভাগ

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা।

ফোন ঃ ০১৬১২৯৫৩৬৭০, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০

৩৪/১ নর্থব্রুক হল রোড, বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০, ফোন: ০১৭৪১৬৭৭৩৯৯

Web: www.dhakabic.com, E-mail : dhakabic@gmail.com

সম্পাদকীয়

মহান বিজয়ের মহিমান্বিত মাস ডিসেম্বর। এ মাসের ১৬ তারিখে অর্জিত হয়েছে স্বাধীনতা যুদ্ধের বিজয়। রক্তের সাগর পাড়ি দিয়ে বাংলাদেশ ছিনিয়ে এনেছে স্বাধীনতার লাল সবুজ পতাকা। দীর্ঘ নয় মাসের রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে অনেক ত্যাগ ও প্রাণের বিনিময়ে আমরা অর্জন করেছি স্বাধীনতা। পশ্চিম পাকিস্তান বরাবরই তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ করত। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ভাষা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতেও তারা অস্বীকার করে। মূলত: তখন থেকেই শুরু হয় স্বাধীকার আন্দোলন। রক্ত দিয়ে তখন ভাষার অধিকার আদায় করেছিল এদেশের জনসাধারণ। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে জনগণের রায়ে নিরংকুশভাবে বিজয়ী দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না করায় এদেশের জনগণ ক্ষোভে ফেটে পরে। শুরু হয় স্বাধীনতার সংগ্রাম। এ সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম বা মুক্তিযুদ্ধ নামে খ্যাত। বস্তুত: শোষণ-বঞ্চনা, বৈষম্য ও অগণতান্ত্রিক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদই মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতা যুদ্ধে রূপ নেয় এবং সে যুদ্ধে এদেশের জনগণ বিজয় লাভ করে।

স্বাধীনতার পর দীর্ঘ ৫৪ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে। কিন্তু যে চেতনা নিয়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছে, তা হোঁচট খেয়েছে বার বার। কখনো একদলীয় শাসন, কখনো সামরিক শাসন আবার কখনো শাসকদের স্বেচ্ছাচারিতার কারণে গণতন্ত্র বিঘ্নিত হয়েছে বার বার। অপরদিকে দুর্নীতি দেশকে গ্রাস করে ফেলেছে। এদেশ দুর্নীতিতে পাঁচবার বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। অন্যায়-জুলুম-বৈষম্য, রাজনৈতিক নিপীড়ন সীমা ছাড়িয়ে গেছে। একশ্রেণীর ব্যবসায়ীর সিন্ডিকেটের মাধ্যমে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি করে শোষণ, এক শ্রেণীর আমলা ও রাজনীতিবিদের ঘুষ-দুর্নীতি ও আত্মসাতের মাধ্যমে শোষণ, সন্ত্রাস, খুন, ছিনতাই, নারী নির্যাতন ইত্যাদি স্বাধীনতাকে অর্থবহ হতে দিচ্ছে না। এসকল কারণে স্বাধীনতার সুফল জনগণ পুরোপুরি উপভোগ করতে পারছেনা এবং কাঙ্ক্ষিত শান্তি, সম্মৃদ্ধি ও অগ্রগতিও অর্জিত হচ্ছে না।

এগুলোর বিরুদ্ধে ২০২৪ সালের জুলাই মাসে ছাত্র-জনতা ফুঁসে উঠে। শুরু হয় বৈষম্য ও দুর্নীতিবিরোধী আন্দোলন। সে আন্দোলনে ফ্যাসিস্ট-স্বৈরাচার ক্ষমতাচ্যুত হয়। কিন্তু এখনো দুর্নীতি, চাঁদাবাজি চলছেই। এ অবস্থায় ২০২৬ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচনের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এ নির্বাচন দেশের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমেই নির্ধারিত হবে পুরাতন ধারার দুর্নীতিগ্রস্ত রাজনৈতিক শক্তি নাকি দুর্নীতিমুক্ত ইসলামী ধারার নতুন রাজনৈতিক শক্তি দেশ শাসনের সুযোগ লাভ করবে। প্রকৃতপক্ষে দেশের একটি পরিবর্তন প্রয়োজন। সে পরিবর্তন হতে হবে দুর্নীতির বিরুদ্ধে সততার, অন্যায়ের বিরুদ্ধে ন্যায়ের, অমানবিকতার বিরুদ্ধে মানবিকতার, শোষণের বিরুদ্ধে সেবার। আসুন আমরা আগামী নির্বাচনে পরিবর্তনের পক্ষে অবস্থা গ্রহণ করি, তাহলে বাংলাদেশ তার জরাগ্রস্ত পুরাতন খোলস থেকে বের হয়ে উন্নয়নের নতুন অগ্রযাত্রায় যুক্ত হবে। ■

হিদায়াত লাভের উপায়

أَعُوذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيم

{فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ. وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ}

অনুবাদ: 'অতএব আল্লাহ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন এবং কাউকে পথভ্রষ্ট করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ অত্যাধিক সংকীর্ণ করে দেন, মনে হয় যেন সে কষ্ট করে আকাশে উঠছে। এভাবেই আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেন, যারা ঈমান আনে না। আর এটাই আপনার রব নির্দেশিত সঠিক পথ। যারা উপদেশ গ্রহণ করে আমরা তাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি', [আল-আন'আম- ৬: ১২৫– ১২৬]।

নামকরণ: সূরাটির ১৩৬, ১৩৯ ও ১৪২ নং আয়াতসমূহে উল্লেখিত 'আল আন'আম' শব্দটিকেই এ সূরার নামকরণ করা হয়েছে। এ শব্দটির অর্থ গৃহপালিত জন্তু।

নাযিলের সময়কাল: সূরাটি মাক্কী সূরা হিসেবেই প্রসিদ্ধ। কয়েকটি আয়াত ছাড়া গোটা সূরাটিই একযোগে মাক্কায় অবতীর্ণ হয়েছে।

মূল বিষয়বস্তু: সূরাটির মূল আলোচ্য বিষয় হচ্ছে; তাওহীদ, রিসালাত, ও আখিরাত। তাফসীরকারকদের মধ্যে মুজাহিদ, কালবী, কাতাদাহ প্রমূখও প্রায় এ কথাই বলেছেন। আবু ইসহাক ইসফিরায়িনী বলেন, এ সূরাটিতে তাওহীদের সমস্ত মূলনীতি ও পদ্ধতি বর্ণিত হয়েছে। সূরাটি الْحَمْدُ لِلهِ দিয়ে শুরু হয়েছে, এতে অবহিত করা হয়েছে যে, সর্ববিধ প্রশংসা একমাত্র আল্লাহর জন্য। [তাফসীরুল কুরতুবী ৬/৩৮২]।

সূরাটির ফযীলত: জাবির, ইবন 'আব্বাস, আনাস ও ইবন মাস'উদ (রা) বলেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সূরা আল–আন'আম নাযিল হচ্ছিল, তখন এত ফেরেশতা তার সাথে নাযিল হয়েছিল যে, তাতে আকাশের প্রান্তদেশ ছেয়ে যায়, [আল–হাকিম, আল–মুস্তাদরাক ২/২৭০, নং ২৪৩১]। 'উমার (রা) বলেন, সূরা আল–আন'আম কুরআন কারীমে উত্তম অংশের অন্তর্গত, [সুনানুদ দারিমী ২/৫৪৫, নং ৩৪০১]

ব্যাখ্যা ও সংক্ষিপ্ত তাফসীরঃ মহান আল্লাহর বাণীঃ فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ 'বস্তুতঃ আল্লাহ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন'।

আয়াতে উল্লেখিত বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করার অর্থ, কারো জন্য ইসলামকে সহজ করে দেয়া, ইসলামের ব্যাপারে উদ্যমী ও উৎসাহী করা, [তাফসীরুত তাবারী ১২/৯৮]। 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, বক্ষ উন্মুক্ত করার অর্থ হলো, তাওহীদ ও ঈমানের জন্য তা প্রশস্ত হওয়া, [তাফসীর ইবন কাসীর ৩/৩৩৪]। অন্যান্য আয়াতেও মহান আল্লাহ এ বিষয়টি উল্লেখ করেছেন। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{أَفَمَنْ شَرَحَ اللَّهُ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ فَهُوَ عَلَى نُورٍ مِنْ رَبِّهِ}

'আল্লাহ ইসলামের জন্য যার বক্ষ উন্মুক্ত করে দিয়েছেন ফলে সে তার রবের দেয়া নূরের উপর রয়েছে', [আয্- যুমার- ৩৯: ২২]। অপর আরেকটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ}

'কিন্তু আল্লাহ তোমাদের কাছে ঈমানকে প্রিয় করেছেন এবং সেটাকে তোমাদের হৃদয়ে সৌন্দর্যমণ্ডিত করেছেন। আর কুফরী, পাপাচার ও অবাধ্যকতাকে তোমাদের কাছে অপ্রিয় করেছেন', [আল- হুজুরাত- ৪৯: ৭]।

মহান আল্লাহর বাণীঃ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ 'আর কাউকে পথভ্রষ্ট করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ অত্যাধিক সংকীর্ণ করে দেন, মনে হয় যেন সে কষ্ট করে আকাশে উঠছে'। এখানে বক্ষ সংকীর্ণ করার অর্থ, কঠিন, দুর্ভেদ্য করে দেয়া। 'উমার (রা) বলেন, মুনাফিকের হৃদয় হলো অনুরূপ, সেখানে ভাল কোন কিছু পৌঁছতে পারে না, [তাফসীরুত তাবারী ১২/১০৪, তাফসীরুল বাগাভী ২/১৫৮]। অপরদিকে মুজাহিদ ও সুদ্দী বলেন, এর অর্থ, সন্দেহ- সংশয়ের মধ্যে পড়ে থাকা। মানসিক অস্থিরতার মধ্যে থাকা, [তাফসীর ইবন কাসীর ৩/৩৩৬]।

আল্লাহ সুবাহানাহু তারপরে বলেন, كَذَلِكَ يَجْعَلُ اللَّهُ الرِّجْسَ عَلَى الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ 'এভাবেই আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দেন, যারা ঈমান আনে না'। অর্থাৎ যারা এভাবে ঈমান আনে না, আল্লাহ তাদের প্রতি ধিক্কার দেন। তাদের অন্তরে সত্য স্থান পায় না এবং তারা প্রত্যেক মন্দ ও অপকর্মে উল্লাসে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এ আয়াতে الرِّجْسَ 'আররিজস' বলতে কি বুঝানো হয়েছে সে সম্পর্কে কয়েকটি মত রয়েছে; 'আব্দুল্লাহ ইবন 'আব্বাস (রা) বলেন, এর দ্বারা শায়তানকে বুঝানো হয়েছে; অর্থাৎ সংকীর্ণ বক্ষে শায়তান গেড়ে বসে, ফলে তার ঈমান আনার নসীব হয় না। মুজাহিদ বলেন, 'আররিজস' দ্বারা কল্যাণহীনতাকে বুঝানো হয়েছে; অর্থাৎ যারা ঈমান পোষণ করবে না তাদের হৃদয়-মন সংকীর্ণ হওয়ার কারণে সেখানে কোন কল্যাণ নেই। 'আব্দুর রহমান ইবন যায়িদ ইবন আসলাম বলেন, এখানে 'আররিজস' দ্বারা 'আযাব বুঝানো হয়েছে; অর্থাৎ যারা ঈমান আনবেনা তাদের উপর শাস্তি নির্ধারিত হয়ে আছে, [তাফসীরুত তাবারী ১২/১১০- ১১১, তাফসীরুল বাগাভী ২/১৫৮, তাফসীর ইবন কাসীর

৩/৩৩৭]। এসব আয়াতে হিদায়াত লাভের উপায় বলা হয়েছে। অন্যান্য দলীল– প্রমাণ থেকে হিদায়াত লাভের আর কিছু উপায় জানা যায়, যেমন;

এক. ইসলাম ও ইসলামী শিক্ষার জন্য হৃদয়–মন প্রশস্ত হওয়া ও উন্মুক্ত হওয়া। উপর্যুক্ত আয়াতে এ বিষয়টি স্পষ্টভাবেই বলা হয়েছে যে, فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ 'বস্তুতঃ আল্লাহ কাউকে সৎপথে পরিচালিত করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ ইসলামের জন্য উন্মুক্ত করে দেন'। আর ইসলামে জন্য অন্তর খুলে যাওয়ার চাবি হচ্ছে, নির্ভেজাল ও শিরকমুক্ত তাওহীদ। অপরদিকে শিরক ও ভ্রষ্টতা হচ্ছে হৃদয়– মন সংকীর্ণ হওয়ার বড় কারণ। আর তাওহীদ যখন হিদায়াতের চাবি তখন সকল প্রকার নেক 'আমল হচ্ছে সে চাবির দাঁত। তাই বিশুদ্ধ তাওহীদী 'আকীদার সাথে সাথে সৎকর্ম এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিরংকুশ আনুগত্য করার ক্ষেত্রে অত্যন্ত আন্তরিক হতে হবে।

দুই. হিদায়াত লাভের আরেকটি উপায় হচ্ছে সর্বদা আল্লাহ তা'আলার যিকর ও তাঁকে স্মরণ করা, আল্লাহর যিকর সকল অবস্থায় হৃদয়–মনকে আল্লাহর সাথে সম্পর্কযুক্ত করে এবং হৃদয়ের প্রশান্তি ও বক্ষ উন্মুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে বিরাট ভূমিকা রাখে। মহান আল্লাহ বলেন,

{الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ}

'যারা ঈমান আনে এবং আল্লাহর স্মরণের দ্বারা যাদের মন প্রশান্ত হয়; জেনে রাখ, আল্লাহর স্মরণেই মন প্রশান্ত হয়', [আর রা'দ– ১৩: ২৮]। এ প্রসঙ্গে হাদীসেরও অনেক বাণী আছে, আবু মূসা আলআশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

مَثَلُ الَّذِي يَذْكُرُ رَبَّهُ وَالَّذِي لاَ يَذْكُرُ رَبَّهُ، مَثَلُ الحَيِّ وَالمَيِّتِ

'যে ব্যক্তি তার রবের যিকর করে আর যে ব্যক্তি তাঁর রবের যিকির করে না, তাদের উদাহরণ হলো জীবিত ও মৃত ব্যক্তির ন্যায়', [সাহীহুল বুখারী ৮/৮৬, নং ৬৪০৭]। উল্লেখ্য দিন রাত ও সকাল– সন্ধ্যার অনেক আযকারে মাসনূনাহ তথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রচুর যিকর– আযকার ও দু'আ সাহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে। এসব যিকর– আযকার পাঠে পর্যাপ্ত উপকারিতা ও হিদায়াত পাওয়া এবং এর উপর অবিচল থাকার তাওফীক হতে পারে ইনশা আল্লাহ।

পক্ষান্তরে যারা আল্লাহ তা'আলা থেকে গাফিল ও উদাসীন থাকে তাদের উপর শায়তান চড়াও হয়। শায়তান সর্বক্ষণ তাদের সাথী ও বন্ধু হিসেবে লেগে থাকে। হিদায়াতের পথে চলতে তাদেরকে পদে পদে বাধার সৃষ্টি করে। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ}

'আর যে রাহমানে যিকর থেকে বিমুখ হয় আমরা তার জন্য এক শায়তান নিয়োজিত করি, অতঃপর সে হয় তার সহচর। আর নিশ্চয় তারাই মানুষদেরকে সৎপথ থেকে বাধা

দেয়, অথচ মানুষরা (ভ্রান্ত পথে থাকার পরও) মনে করে তারা হিদায়াতপ্রাপ্ত', [আয্–যুখরুফ– ৪৩: ৩৬, ৩৭]। অর্থাৎ শায়তান দ্বারা প্রভাবিত লোকজন শায়তানের পথকেই সুশোভিত করার কারণে সেটাকেই হক ও হিদায়াতের পথ মনে করতে থাকে।

তিন. বিনয়, গভীর চিন্তা ও গবেষণাসহ কুরআন কারীম অধ্যয়ন করা, এটা সত্য যে, কুরআন তিলাওয়াত সর্বোত্তম যিকর। কিন্তু কুরআন কারীম তিলাওয়াতের যথেষ্ট গুরুত্ব ও মাহাত্ম রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ وَيُبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا}

'নিশ্চয় এ কুরআন অধিক সরল ও সুদৃঢ় পথের দিকে হিদায়াত করে এবং সৎকর্মপরায়ণ মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহাপুরস্কার', [বানু ইসরাঈল– ১৭: ৯]। অর্থাৎ আল–কুরআন মানুষের অনুভূতি, প্রকাশ্য, গোপন, আকীদাহ– বিশ্বাস এবং 'আমল– আখলাক ও নৈতিকতা; সর্বক্ষেত্রেই সঠিক অবস্থার উপর অবিচল থাকার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখে। এসব কিছুকে এক সুদৃঢ় বন্ধনে কঠিনভাবে বেঁধে রাখে যা কখনো বিচ্ছিন্ন হওয়া বা ছিঁড়ে যাওয়ার আশংকা নেই। এর নিচের দিকের শিঁকড় মাটির গভীরে প্রোথিত এবং উপর দিকটা কেবল উপরের উচ্চতার দিকে ধাবমান, [ফী যিলালিল কুরআন ৪/২২১৫]। আল–কুরআনের এই মাহাত্ম তারাই জানে যাদেরকে এই বিশাল জ্ঞান দেয়া হয়েছে। আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ}

আর যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে, তারা জানে যে, আপনার রবের কাছ থেকে আপনার প্রতি যা নাযিল হয়েছে, তা–ই সত্য এবং এটা পরাক্রমশালী প্রশংসিত আল্লাহর পথ নির্দেশ করে', [সাবা– ৩৪: ৬]। আল–কুরআন মানুষদেরকে হিদায়াতের পথ দেখায় এ কারণে কাফিরগণ এই কুরআন শুনতে মানুষদেরকে বাধা দিত। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ}

'আর কাফিরগণ বলে, তোমরা এই কুরআন শোন না এবং তা পাঠের সময় শোরগোল কর, যাতে তোমরা জয়ী হতে পার', [হা–মীম আস– সাজদাহ– ৪১: ২৬]। নফসের উপর আল–কুরআনের প্রভাব প্রত্যক্ষ ও দৃশ্যমান। কঠিন অন্তরের অধিকারী এবং গভীর ভ্রষ্টতা, যার সর্বোচ্চ হচ্ছে কুফরী; এর মধ্যে থেকেও আল–কুরআনের প্রভাব তার মধ্যে কার্যকরী ও ক্রিয়াশীল হয়েছে। সহীহুল বুখারীতে জুবাইর ইবন মুত'য়িম এর মত কুরাইশ নেতা কাফিরের অন্তরেও কুরআন কারীম প্রভাব বিস্তার করেছে। জুবাইর ইবন মুত'য়িম যখন বদর যুদ্ধের বন্দীদের ব্যাপারে কথা বলার জন্য মাদীনায় আগমন করেন। অতঃপর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিবের সালাতে সূরা আত্–তূর থেকে কিরা'আত পড়ছিলেন তখন তিনি (বাহির থেকেই) কুরআনের কিছু আয়াত শ্রবণ

করেন। জুবাইর নিজেই এ ঘটনার বর্ণনা দিয়ে বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন

{أَمْ خُلِقُوا مِنْ غَيْرِ شَيْءٍ أَمْ هُمُ الخَالِقُونَ، أَمْ خَلَقُوا السَّمَوَاتِ وَالأَرْضَ بَلْ لاَ يُوقِنُونَ، أَمْ عِنْدَهُمْ خَزَائِنُ رَبِّكَ أَمْ هُمُ المُسَيْطِرُونَ}

'তারা কি স্রষ্টা ছাড়া সৃষ্টি হয়েছে, না তারা নিজেরাই স্রষ্টা? নাকি তারা আসমানসমূহ ও যমীন সৃষ্টি করেছেন? বরং তারা দৃঢ় প্রত্যয়ী নয়। আপনার রবের গুপ্তভাণ্ডার কি তাদের কাছে রয়েছে, নাকি তারা এ সবকিছুর নিয়ন্ত্রণকারী?', [আত্- তূর- ৫২: ৩৫-৩৭] আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেন, তখন মনে হয় আমার অন্তর যেন ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যাবে', [সাহীহুল বুখারী ৬/১৪০, নং ৪৮৫৪]।

চার. আল্লাহর সৃষ্টিকুল নিয়ে চিন্তা- ভাবনা এবং আকাশসমূহ ও যমীনের রাজত্বের দিকে গভীর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা, নিঃসন্দেহে চিন্তাশীল জ্ঞানী ব্যক্তিরা যখন এই সৃষ্টি জগতের দিকে গভীর ও অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টি নিয়ে তাকাবে তখন তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাসী, বিনয়ী এবং তাঁর হিদায়াত দ্বারা হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েই ফিরবে। তারা সিদ্ধান্ত নিবে যে, প্রকৃতির পক্ষে এই সৃষ্টি ও জীবন দান করা সম্ভব নয়। আবার এই বিশ্ব জগত আকস্মিক কোন দুর্ঘটনার ফসল হওয়া অসম্ভব। বরং নিশ্চিত যে, এসব কিছুর স্রষ্টা হচ্ছে মহাবিজ্ঞ, মহান স্রস্টা সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তা'আলা। মহিমান্বিত আল্লাহ বলেন,

{إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ. الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ}

'নিশ্চয় আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টিতে, রাত ও দিনের পরিবর্তনে বোধশক্তি সম্পন্ন লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শুয়ে আল্লাহর স্মরণ করে এবং আসমানসমূহ ও যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করে, আর বলে, হে আমাদের রব! আপনি এগুলো অনর্থক সৃষ্টি করেননি', [আলে 'ইমরান-৩ : ১৯০-১৯১]। অর্থাৎ রাতের গমন এবং দিবসের আগমন কিংবা কখনো রাত দীর্ঘ হওয়া দিনের খাট হওয়া অথবা এক দেশে দিন অন্য দেশে রাত ইত্যাদিকে রাত দিনের পরিবর্তন বলা হয়। আল্লাহর এসব সৃষ্টিতে কোন ভুল-ত্রুটি ও অসংগতি নেই। এ কথার চ্যালেঞ্জ দিয়ে আল্লাহ বলেন,

{الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ طِبَاقًا مَا تَرَى فِي خَلْقِ الرَّحْمَنِ مِنْ تَفَاوُتٍ فَارْجِعِ الْبَصَرَ هَلْ تَرَى مِنْ فُطُورٍ. ثُمَّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كَرَّتَيْنِ يَنْقَلِبْ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِئًا وَهُوَ حَسِيرٌ}

'যিনি স্তরে স্তরে সাত আসমান সৃষ্টি করেছেন। রাহমানের সৃষ্টিতে আপনি কোন খুঁত দেখতে পাবেন না; আপনি আবার তাকিয়ে দেখুন, কোন ত্রুটি দেখতে পান কি? তারপর আপনি দ্বিতীয়বার দৃষ্টি ফেরান, সে দৃষ্টি ব্যর্থ ও ক্লান্ত হয়ে আপনার দিকে ফিরে আসবে', [আল-মুলক- ৬৭: ৩, ৪]। অতএব আল্লাহ তা'আলার এসব সৃষ্টি নিয়ে গভীর

চিন্তা ও গবেষণা করলে তা থেকে সন্দেহাতীত সিদ্ধান্তে পৌঁছা যায় যে, আল্লাহ তা'আলাই এগুলোর সৃষ্টিকর্তা এবং এগুলো তিনি অনর্থক সৃষ্টি করেননি। বরং এসব কিছুকে মানুষের কল্যাণের জন্যই তৈরী করা হয়েছে আর মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে শুধুমাত্র তাঁরই দাসত্ব করার জন্য। তাই আল্লাহর সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা–ভাবনা করাও হিদায়াত লাভের একটি অনন্য উপায়।

পাঁচ. সৎ ও উত্তম লোকদের সাথে উঠাবসা ও সঙ্গ লাভ করা, ভাল মানুষদের সাথে বন্ধুত্ব ও সম্পর্ক স্থাপন করা এবং উঠাবসা করাও হিদায়াত লাভের একটি অন্যতম উপায়। কেননা এমন অনেক উদাহরণ আছে যে, একজন খারাপ ব্যক্তি ভাল মানুষের সংশ্রবে এসে সেও ভাল ও সৎ মানুষ হয়েছে। আবার উল্টা চিত্রও আছে। আর মানুষ দুনিয়াতে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে এটা তার স্বভাব সম্মত বিষয়। বন্ধুর উপর বন্ধুর প্রভাব সৃষ্টি হওয়া এটাও একটি স্বাভাবিক বিষয়। তাই প্রত্যেক ব্যক্তিকে বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক ও গভীর মনোযোগী হতে হবে। আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীসে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন,

الرَّجُلُ عَلَى دِينِ خَلِيلِهِ، فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ

'ব্যক্তি তার বন্ধুর দীনের উপরই অবস্থান করে; সুতরাং তোমাদের কারো ভেবে দেখা উচিত কার বন্ধুত্ব করবে', [সুনান আবি দাউদ ৪/২৫৯, নং ৪৮৩৩, সুনানুত তিরমিযী ৪/১৬৭, নং ২৩৭৮, আলবানী হাদীসটিকে হাসান বলেছেন]। শুধুমাত্র সৎ লোকদেরকে ভালবাসা এবং তাদের কর্মগুলোকে পছন্দ করার কারণেই ব্যক্তির সামনে যদি তার নিয়াত সঠিক হয়, হিদায়াত ও সকল কল্যাণের দ্বার উন্মোচিত হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এমন এক ব্যক্তি সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হলো, যে ব্যক্তি একদল মানুষকে ভালোবাসে অথচ তাদের সাথে তার দেখা হয়নি। তিনি বললেন,

الْمَرْءُ مَعَ مَنْ أَحَبَّ

'ব্যক্তি তার সাথেই অবস্থান করবে যাকে সে ভালোবাসে', [সাহীহুল বুখারী ৮/৩৯, নং ৬১৬৯, সাহীহ মুসলিম ৪/২০৩৪, নং ২৬৪০]। সুতরাং ভাল বন্ধুর প্রভাবে ভাল হয়ে যাওয়া এবং মন্দ বন্ধুর সংশ্রবে খারাপ হয়ে যাওয়ার বিষয়টি একেবারেই স্পষ্ট। দুনিয়াতে দুষ্ট ও মন্দ বন্ধুরাই কিয়ামাতের দিন একে অপরের শত্রুতে পরিণত হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

{الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ}

'বন্ধুরা সেদিন একে অন্যের শত্রু হয়ে পড়বে, মুত্তাকীরা ছাড়া', [আয়– যুখরুফ- ৪৩: ৬৭]। তাই আল্লাহ সুবহানাহুর সাহায্য নিয়ে ভালো মানুষদের সাথে উঠাবসা করা এবং তাদের সাথী হয়ে নিজের পরিমন্ডলকে কল্যাণময় করে তোলার আপ্রাণ চেষ্টা করা। আর নিজেকে দুষ্ট ও মন্দ লোকদের থেকে দুরত্ব বজায় রেখে চলা উচিত। কেননা সৎ সঙ্গ

লাভ ও তাদের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন করা সঠিক পথ ও হিদায়াত লাভের একটি অনন্য উপায়।

ছয়. আল্লাহর নিকট হিদায়াতের জন্য দু'আ করা, হিদায়াত ও সিরাতে মুস্তাকীম লাভের জন্য সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে মহান করুণাময় আল্লাহর নিকট অনবরত দু'আ করা। দু'আ হচ্ছে মু'মিনের কঠিন সময়ের হাতিয়ার। দু'আর মাধ্যমে ব্যক্তি বিনা শ্রমে ও বিনা মূলে সফলতার উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করতে পারে। তাই হিদায়াত লাভের জন্য যত উপায় অবলম্বন করা হোক না কেন দু'আ হচ্ছে সবচেয়ে বড় উপায়। তাই সর্বদা দু'আ করাই যেন মু'মিন ব্যক্তির অভ্যাসে পরিণত হয়। দু'আ কবূলের সুসংবাদ দিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ}

'আর তোমাদের রব বলেন, তোমরা আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। নিশ্চয় যারা অহংকারবশে আমার 'ইবাদাত থেকে বিমুখ থাকে, তারা অচিরেই লাঞ্ছিত হয়ে জাহান্নামে প্রবেশ করবে', [আল-মু'মিন- ৪০: ৬০]। হিদায়াতের জন্য দু'আ করার জন্য কুরআন কারীম ও সাহীহ সুন্নাতে নির্দেশনা রয়েছে। মহান আল্লাহ আমাদেরকে শিখিয়েছেন,

{اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ}

'আমাদেরকে সরল পথের হিদায়াত দিন', [আল- ফাতিহা- ১: ৬]। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

{رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ}

'হে আমাদের রব! হিদায়াত দান করার পর আপনি আমাদের অন্তরসমূহকে ভ্রষ্ট করবেন না। আর আপনার কাছ থেকে আমাদেরকে করুণা দান করুন, নিশ্চয় আপনি মহাদাতা',[আলে 'ইমরান- ৩: ৮]। একটি হাদীসে কুদসীতে আছে, আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহ তা'আলা থেকে বর্ণনা করেন যে, আল্লাহ তাবারাক ওয়া তা'আলা বলেন,

"..يَا عِبَادِي كُلُّكُمْ ضَالٌّ إِلَّا مَنْ هَدَيْتُهُ، فَاسْتَهْدُونِي أَهْدِكُمْ،.."

'হে আমার বান্দা! আমি যাকে হিদায়াত দান করেছি সে ব্যতীত তোমরা সবাই পথভ্রষ্ট। অতএব তোমরা আমার কাছে হিদায়াত চাও আমি তোমাদের হিদায়াত দান করব', [সাহীহ মুসলিম ৪/১১৪, নং ২৫৭৭, সুনানুত তিরমিযী ৪/২৩৮, নং ২৪৯৫]। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রচুর দু'আ করতেন, ক্লান্ত হতেন না। অথচ আল্লাহ তা'আলা তার পূর্বাপর সকল গুনাহ মাফ করে দিয়েছেন।

তাই হিদায়াত লাভের জন্য অনবরত আল্লাহ সুবহানাহুর নিকট দু'আ করা জরুরী। এক্ষেত্রে দু'আ কবূলের সময়গুলোর প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দু'আ করার জন্য সেসময়গুলোকে বেছে নেয়া।

সাত. আল্লাহর সাথে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করা, মহান করুণাময় আল্লাহর সাথে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপন এবং মজবুত ভাবে তাঁকে আঁকড়ে ধরা হিদায়াত লাভের আরেকটি অনন্য উপায়। মহান আল্লাহ বলেন,

{وَمَنْ يَعْتَصِمْ بِاللَّهِ فَقَدْ هُدِيَ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ}

'আর কেউ আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে অবলম্বন করলে সে অবশ্যই সরল পথের হিদায়াতপ্রাপ্ত হবে', [আলে 'ইমরান- ৩: ১০১]।

আট. আল্লাহর সন্তুষ্টির পথে প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা করা, যেসব কার্যক্রম মহান রবকে খুশী করে সেসব কর্ম সম্পন্ন করার জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করা, হৃদয় -মন ও নফসের কঠিন মুজাহাদাহ বা সর্বাত্মক চেষ্টা করা হিদায়াত লাভের আরেকটি উপায়। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

{وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ}

'আর যারা আমাদের পথে সর্বাত্মক চেষ্টা চালায়, আমরা তাদেরকে অবশ্যই আমাদের পথসমূহের হিদায়াত দিব। আর নিশ্চয় আল্লাহ মুহসিনদের সঙ্গে আছেন', [আল- 'আনকাবূত- ২৯: ৬৯]। অর্থাৎ যারা আল্লাহর পথে আন্তরিকতার সাথে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করে, তাদেরকে আল্লাহ তাদের অবস্থার উপর ছেড়ে দেন না। বরং তিনি তাদেরকে পথ দেখান এবং আল্লাহর দিকে যাওয়ার জন্য পথ খুলে দেন, [কুরআনুল কারীম,বাংলা অনুবাদ ২/২০৮২]।

মহান আল্লাহর বাণী, وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا 'আর এটাই আপনার রব নির্দেশিত সরল পথ'। [আল-আন'আম- ৬: ১২৬]। এ আয়াতে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে যে, এটা আপনার রবের সরল পথ। এখানে هَذَا (এটা) শব্দ দ্বারা 'আব্দুল্লাহ ইবন মাস'উদ (রা)র মতে আল কুরআনের দিকে এবং ইবন 'আব্বাস (রা)র মতে ইসলামের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথবা পূর্বোল্লেখিত বিষয়গুলো- যা দীন হিসেবে পরিগণিত- এর দিকে ইশারা করা হয়েছে, [তাফসীরুল বাগাভী ২/১৫৯, ইবন কাসীর ৩/৩৩৭, ফাতহুল কাদীর ২/১৮৩, কুরআনুল কারীম, বাংলা অনুবাদ ১/৬৯৩]। অর্থাৎ এটা আপনার রবের স্বীয় প্রজ্ঞার মাধ্যমে স্থির করা সরল সঠিক দীন। এ বিধান দেয়ার উদ্দেশ্য আল্লাহ তা'আলার নিজের উপকারের জন্য নয় বরং মানুষদের উপকারের জন্য দেয়া হয়েছে। এই বিধান ও কর্মপন্থা মানুষের চিরস্থায়ী সাফল্য ও কল্যাণের নিশ্চয়তা বিধান করে। উল্লেখ্য যে, আয়াতে مُسْتَقِيمًا শব্দটিকে صِرَاطُ এর বিশেষণ হিসেবে উল্লেখ না করে الْحَال (অবস্থা) হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে, [তাফসীর ইবন কাসীর ৩/৩৩৭, ফাতহুল কাদীর ২/১৮৩]। এ থেকে বুঝা যায় যে, মহান রব কর্তৃক স্থিরকৃত পথ মুস্তাকীম বা সরল হওয়া ছাড়া আর কোন সম্ভাবনাই নাই। এ পথের উপর চললে পথভ্রষ্ট হওয়ার কোনই সুযোগ নেই। এতে বাড়াবাড়ি বা ছাড় প্রবণতা নেই। এ পথ মানুষকে স্বাভাবিক পথের দিকেই ধাবিত করে আর এ পথটিই হচ্ছে, ইসলাম, [তাফসীরুল বাগাভী ২/১৫৯, ফাতহুল কাদীর ৭//৮৩]।

قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ 'যারা উপদেশ গ্রহণ করে আমরা তাদের জন্য নিদর্শনসমূহ বিশদভাবে বিবৃত করেছি', অর্থাৎ আমি দীনের মৌলিক বিষয়গুলোকে পরিস্কার ও বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি, এতে কোন সংক্ষিপ্ততা বা অস্পষ্টতা রাখা হয়নি। আর এ উপদেশ তারাই কেবল বিবেচনা করে যারা উপদেশ গ্রহণ করার উদ্দেশ্যে আল-কুরআন নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও গভীর অধ্যাবসায় চালায় এবং জিদ ও বাপ-দাদার প্রথার অনুসরণের উপর অবিচল থাকে না, [তাফসীরুত তাবার ১২/১১৩, ইবন কাসীর ৩/৩৩৭, কুরআনুল কারীম, বাংলা অনুবাদ ১/৬৯৪]। সুতরাং হিদায়াত লাভ মানব জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অর্জন। এর উপরই মানুষের ইহকার ও পরকালের সফলতা নির্ভর করে। তাই যারা সঠিক পথের দেখা পেয়েছে এবং সে পথের উপর চলেছে। সে হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়েছে। কেননা খাঁটি তাওহীদ ও শিরকমুক্ত ঈমানের উপর অবিচল থাকলে তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত হয়। মহান আল্লাহ বলেন,

{الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ}

'যারা ঈমান এনেছে এবং তারা তাদের ঈমানকে যুলম (শিরক) দ্বারা কলুষিত করেনি, নিরাপত্তা কেবল তাদের জন্য এবং তারাই হিদায়াতপ্রাপ্ত', [আল-আন'আম- ৬: ৮২]। আর কারো হিদায়াত নসীব হলে তাদের তার জন্য আল্লাহর প্রশংসা করা উচিত। হিদায়াত লাভের দরুন জান্নাতীরা আল্লাহর প্রশংসা করবেন। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ সুবহানাহু বলেন,

{وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا اللَّهُ}

'আর তারা বলবে, যাতীয় প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাদেরকে এ পথের হিদায়াত দান করেছেন। আল্লাহ আমাদেরকে হিদায়াত না করলে, আমরা কখনো হিদায়াত পেতাম না', [আল- আ'রাফ- ৭: ৪৩]। অপর দিকে হিদায়াতের পথ পেয়ে তা থেকে যেন আমরা বিপথগামী না হই এবং মন যেন ভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত না হয় সে জন্যে করুণাময় আল্লাহর কাছে অনবরত দু'আ করতে হবে যে, আল্লাহ যেন দয়া করে হিদায়াতের উপর অবিচল রাখেন।

শিক্ষাসমূহ: উপর্যুক্ত আয়াতগুলো থেকে অনেক শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে, যেগুলোর অন্যতম হচ্ছে;

এক. প্রত্যেক মানুষের জানা উচিত যে, আল্লাহ প্রদত্ত সঠিক পথ ও হিদায়াত লাভের উপর মানুষের ইহকালীন সফলতা ও পরকালীন মুক্তি, পুরস্কার ও প্রকৃত সফলতা নির্ভর করছে।

দুই. প্রতেক মানুষের মনে রাখা উচিত যে, হিদায়াত দেয়ার একমাত্র মালিক হচ্ছেন, মহান আল্লাহ, তিনি যাকে হিদায়াত দান করেন তার হৃদয়- মনকে দীনের জন্য খুলে দেন। সে তখন হিদায়াত লাভ করে। আর যে ব্যক্তি হিদায়াত লাভের কোন ইচ্ছাই পোষণ করে না আল্লাহ তার হৃদয়-অন্তরকে সংকীর্ণ করে দেন। ফলে সে বিপথগামী হয়।

তিন. হিদায়াত লাভ ও এর উপরে সুদৃঢ় থাকার জন্য যে সকল উপায়– উপকরণের কথা উপরে আলোচিত হয়েছে সেসব উপায় অবলম্বন করা অপরিহার্য।

চার. হিদায়াত লাভের জন্য সদাসর্বদা আল্লাহর কাছে দু'আ করা অত্যন্ত জরুরী; কেননা হিদায়াত পাওয়ার সবচেয়ে বড় উপায় হচ্ছে এই দু'আ করা যে, হে করুণাময় আল্লাহ! আমাকে হিদায়াত দান কর এবং এর উপর চলার তাওফীক দান কর।

পাঁচ. সকলের মনে রাখা বাঞ্ছনীয় যে, আল্লাহ প্রদত্ত পথ একমাত্র সঠিক পথ ও সিরাতে মুস্তাকীম। অন্য সকল পথ বক্র ও ভ্রষ্ট পথ। সুতরাং সকল মানুষের আল্লাহর পথে চলাই অপরিহার্য।

ছয়. মানুষের সন্দেহাতীত ভাবে বিশ্বাস করতে হবে যে, আল্লাহ, তাঁর রাসূল ও আল্লাহর দীনের প্রতি ঈমান আনা এবং সে অনুযায়ী জীবন পরিচালনা করা ছাড়া মুক্তির আর কোন পথ নাই। সুতরাং যার ঈমান আনে না তারা আল্লাহর শাস্তির উপযুক্ত হবে।

মাহান করুণাময় আল্লাহ আমাদেরকে উপর্যুক্ত শিক্ষাগুলো 'আমল করার তাওফীক দান করুন। আর আমাদেরকে হিদায়াত দান করার পর পুনরায় বিপথগামী করবেন। আমীন!!

প্রফেসর শাইখ ড. মুহাম্মাদ আব্দুস সামাদ

এখানে আল ফালাহ বিজ্ঞাপন যাবে

১৪ নং পৃষ্ঠায়

আবাবিল বিজ্ঞাপন

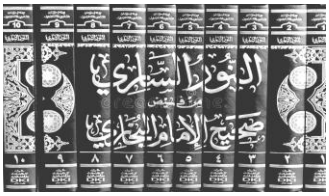

অর্থহীন বিষয়াবলী বর্জন : ইসলামের অপরূপ সৌন্দর্য

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ– « مِنْ حُسْنِ إِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيهِ.

অনুবাদ

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন: "কোনো ব্যক্তির ইসলামের অপরূপ সৌন্দর্য হচ্ছে অর্থহীন বিষয়াবলী বর্জন করা"।[১]

ব্যাখ্যা

মানুষের ওপর মহান আল্লাহ একাধারে তাঁর ইবাদত, খিলাফত প্রতিষ্ঠা ও বাসোপযোগী দুনিয়া বিনির্মাণের দায়িত্ব অর্পণ করেছেন। মানবজাতির এই দায়িত্ব বুঝিয়ে দেয়ার লক্ষে তিনি যুগে যুগে পৃথিবীতে অসংখ্য নবী-রাসূল পাঠিয়েছেন। তিনি জীবনব্যবস্থা হিসেবে তাঁদের দিয়েছেন আল-ইসলাম এবং একই সাথে দিয়েছেন আসমানী গ্রন্থ। মানুষ কীভাবে জীবন পরিচালনা করে দুনিয়ায় শান্তি ও আখিরাতে মুক্তির পথ রচনা করতে পারে সেবিষয়ে তাঁরা সুস্পষ্ট নির্দেশনা দিয়েছেন। মহান আল্লাহ পরীক্ষার উদ্দেশে মানুষের সামনে দু'ধরনের কাজ রেখেছেন : একটি কল্যাণকর এবং অপরটি ক্ষতিকর। অতএব যেসব কথা ও কাজ অর্থহীন এবং পরিণামের দিক থেকে ভয়াবহ সেসবের অন্যতম হলো 'অর্থহীন কথা ও কাজ'।

আমাদের মনের গহীনে লুকিয়ে থাকে অনেক কথা ও কাজের ভাবনা। সেসবের কিছু আছে একান্তভাবে অর্থবহ আবার কিছু আছে অর্থহীন। আমরা অত্র দারসুল হাদীসে উল্লেখযোগ্য কতিপয় অনর্থক বিষয়াবলী সম্পর্কে জানবো এবং জানবো তা থেকে উত্তরণের উপায়ও। যেমন-

(১) অলস সময় কাটানো

'সময়' মহান আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতের অন্যতম। এসময়ের সমষ্টিই আমাদের জীবন। উল্লেখ্য যে, জীবনের সময় অফুরন্ত নয়, একান্তভাবে সীমিত ও সুনির্দিষ্ট। এ জীবনকে অর্থবহ করার জন্য প্রয়োজন সময়ের সদ্ব্যবহার। কিন্তু আমরা কখনো অলসতাবশত এবং বর্তমান সময়ে বিশেষত ডিভাইস ব্যবহার করে অবলীলাক্রমে সময়

১. তিরমিযী, আবওয়াবুয যুহ্দ 'আন রাসূলিল্লাহি সা., বাব : মিন হুসনি ইসলামিল মারয়ি তারকুহু মা লা ইয়া'নিহি, নং ২৪৮৭

নষ্ট করি। সুতরাং একথা নির্দ্বিধায় বলা যায়, অলস সময় কাটানোর কারণে আমাদেরকে কখনো আফসোস করতে হবে দুনিয়ায় এবং নিশ্চিভাবে আখিরাতে। মহান আল্লাহ বলেন,

حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ رَبِّ ارْجِعُونِ . لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ ...

"অবশেষে যখন তাদের কারো মৃত্যু আসবে, সে বলে, হে আমার রব! আমাকে পুনরায় (দুনিয়ায়) ফেরত পাঠাও, যাতে আমি সৎ কাজ করতে পারি, যা আমি পূর্বে করতে পারিনি"...।[২]

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضى الله عنهما قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ–لرجلٍ وهو يَعِظُه: اغْتَنِمْ خَمْسًا قبلَ خَمْسٍ: شبابَكَ قبلَ هَرَمِكَ، وصِحَّتَكَ قبلَ سَقَمِكَ، وغِناءكَ قبلَ فَقْرِكَ، وفَراغَكَ قبلَ شُغلِكَ، وحياتَكَ قبلَ موتِكَ.

ইবন আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) এক ব্যক্তিকে উপদেশ দিয়ে বলেছেন: "পাঁচটি জিনিসকে পাঁচটি জিনিসের পূর্বে গনীমাত মনে করবে, বার্ধক্যের পূর্বে যৌবনকে; অসুস্থতার পূর্বে সুস্থতাকে; দারিদ্রের পূর্বে সচ্ছলতাকে; ব্যস্ততার পূর্বে অবসরকে এবং মৃত্যুর পূর্বে জীবনকে"।[৩] কুরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে যে, অলসভাবে সময় নষ্ট করা নিঃসন্দেহে অনর্থক কাজ।

مَالِكَ إِلاَّ مَا تَصَدَّقْتَ فَأَمْضَيْتَ أَوْ أَكَلْتَ فَأَفْنَيْتَ أَوْ لَبِسْتَ فَأَبْلَيْتَ ».

(২) অধিক হাসি-ঠাট্টা করা

মন ভার করে বসে থাকা যেমন প্রত্যাশিত নয়, তদ্রূপ কাম্য নয়ম হাস্য-রসে ফেটে মত্ত থাকা। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

فَلْيَضْحَكُواْ قَلِيلاً وَلْيَبْكُواْ كَثِيرًا جَزَاء بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُونَ–

"অতএব তারা কিঞ্চিত হাসুক,তারা অধিক কাঁদবে তাদের কৃতকর্মের ফল স্বরূপ"।[৪]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– « مَنْ يَأْخُذُ عَنِّي هَؤُلاَءِ الْكَلِمَاتِ فَيَعْمَلُ بِهِنَّ أَوْ يُعَلِّمُ مَنْ يَعْمَلُ بِهِنَّ ». فَقَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ أَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَأَخَذَ بِيَدِى فَعَدَّ خَمْسًا وَقَالَ « اتَّقِ الْمَحَارِمَ تَكُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا وَلاَ تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ .

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "এমন কে আছে যে আমার নিকট থেকে এ কথাগুলো গ্রহণ করবে এবং তদনুযায়ী আমলও করবে অথবা এমন কাউকে শেখাবে যে তদনুযায়ী আমল করবে? আবূ হুরায়রা (রা) বললেন,

---

২. ২৩-সূরা আল-মুমিনূন : ৯৯-১০০
৩. আল-হাকিম, আল-মুসতাদরাক, নং ৭৮৪৬
৪. সূরা আত-তাওবা: ৮২

আমি বললাম, হে আল্লাহর রাসূল! আমি আছি। তিনি আমার হাত ধরে গুনে গুনে পাঁচটি কথা বলেন, তুমি হারাম বিষয়াদি বর্জন করলে লোকদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বড়ো আবিদ (ইবাদতকারী) হতে পারবে; আল্লাহ তোমার তাকদীরে যা নির্ধারিত করে রেখেছেন তাতে সন্তুষ্ট থাকলে লোকদের মধ্যে সর্বাধিক স্বনির্ভর হতে পারবে; প্রতিবেশীর সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার করলে প্রকৃত মুমিন হতে পারবে; নিজের জন্য যা পছন্দ করো অপরের জন্য তা পছন্দ করলে সত্যিকার মুসলিম হতে পারবে এবং অধিক হাসবে না। কেননা অতিরিক্ত হাসি- কৌতুক হৃদয়কে মৃত্যুবৎ করে দেয়"।[৫] কুরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয়, অহেতুক হাসি- কৌতুকের মাঝে সময় কাটানো অর্থহীন কাজ।

(৩) অনুমাননির্ভর কথা বলা

অনুমাননির্ভর কথা বলা কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ-

"হে মুমিনগণ! তোমরা অধিক অনুমান থেকে বিরত থাকো। কারণ অনুমান কোনো কোনো ক্ষেত্রে পাপ"।[৬] অপর এক আয়াতে উল্লেখ আছে,

إِنَّ الظَّنَّ لاَ يُغْنِي مِنَ الْحَقِّ شَيْئًا .

"সত্যের পরিবর্তে অনুমান কোনো কাজে আসে না"।[৭] এর অনিষ্টকারিতা সম্পর্কে হাদীসেও আলোচনা এসেছে। যেমন,

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضى الله عنه : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ : إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيثِ ، وَلاَ تَحَسَّسُوا ، وَلاَ تَجَسَّسُوا ، وَلاَ تَنَاجَشُوا ، وَلاَ تَحَاسَدُوا ، وَلاَ تَبَاغَضُوا ، وَلاَ تَدَابَرُوا ، وَكُونُوا عِبَادَ اللَّهِ إِخْوَاناً .

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, "তোমরা অহেতুক অনুমান থেকে বিরত থাকো। কারণ অহেতুক অনুমান জঘন্য মিথ্যাচার। তোমরা কারো গোপনীয় বিষয় অনুসন্ধান করো না, গোয়েন্দাগিরি করো না, একে অপরকে ধোঁকা দিও না, একে অপরের প্রতি হিংসা পোষণ করো না, একে অপরের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করো না এবং একে অপরের পেছনে লেগে যেও না। (বরং) তোমরা আল্লাহর বান্দা হিসেবে ভাই ভাই হয়ে থাকো"।[৮] কুরআন ও হাদীস দ্বরা প্রমাণিত হয় অনুমাননির্ভর কথা বলা অনর্থক কাজ।

(৪) দোষ খোঁজা করা

পৃথিবীতে নবী-রাসূল ছাড়া কোনো মানুষ নিষ্পাপ নয়। সুতরাং সকলেরই কিছু না কিছু দোষ-ত্রুটি আছে। সুতরাং কারো দোষ খোঁজা নিঃসন্দেহে অনর্থক কাজ। পরিণামের

---

৫. তিরমিযী, আবওয়াবুয-যুহ্দ, বাব: মানিত-তাকাল মাহারিম ফা-হুয়া আ'বুদুন-নাস, নং ২৪৭৫

৬. ৪৯-সূরা আল-হুজুরাত: ১২

৭. ১০-সূরা ইউনুস : ৩৬

৮. বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাব: মহান আল্লাহর বাণী: হে মুমিনগণ! তোমরা অধিকাংশ অনুমান থেকে বিরত থাকো.... নং ৬০৬৬

দিক থেকেও তা ভয়াবহ। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ...

"এবং তোমরা একে অপরের বিষয় গোপন বিষয় সন্ধান করবে না এবং একে অপরের পেছনে নিন্দা করবে না"।[৯] এ ব্যাপারে হাদীসেও নির্দেশনা রয়েছে। যেমন-

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ صَعِدَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ- الْمِنْبَرَ فَنَادَى بِصَوْتٍ رَفِيعٍ فَقَالَ « يَا مَعْشَرَ مَنْ قَدْ أَسْلَمَ بِلِسَانِهِ وَلَمْ يُفْضِ الإِيمَانُ إِلَى قَلْبِهِ لاَ تُؤْذُوا الْمُسْلِمِينَ وَلاَ تُعَيِّرُوهُمْ وَلاَ تَتَّبِعُوا عَوْرَاتِهِمْ فَإِنَّهُ مَنْ تَتَبَّعَ عَوْرَةَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ تَتَبَّعَ اللَّهُ عَوْرَتَهُ يَفْضَحْهُ وَلَوْ فِى جَوْفِ رَحْلِهِ » قَالَ وَنَظَرَ ابْنُ عُمَرَ يَوْمًا إِلَى الْبَيْتِ أَوْ إِلَى الْكَعْبَةِ فَقَالَ مَا أَعْظَمَكِ وَأَعْظَمَ حُرْمَتَكِ وَالْمُؤْمِنُ أَعْظَمُ حُرْمَةً عِنْدَ اللَّهِ مِنْكِ..

ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) মিম্বরে উঠে উচ্চঃস্বরে ঘোষণা দিয়ে বলেছেন, "হে ঐ জনগোষ্ঠী, যারা তোমরা মুখে ইসলাম গ্রহণ করেছ কিন্তু অন্তরে ঈমান বদ্ধমূল হয়নি! তোমরা মুসলিমদের কষ্ট দিবে না, তাদের লজ্জা দিবে না এবং তাদের গোপন দোষ অবিষ্কারে প্রবৃত্ত হবে না। কেননা যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের গোপন দোষ আবিষ্কারে প্রবৃত্ত হবে, আল্লাহ তার দোষ প্রকাশ করে দিবেন। আর আল্লাহ যার দোষ প্রকাশ করে দিবেন তাকে অপদস্থ করে ছাড়বেন,যদিও সে তার উটের হাওদার ভেতরে অবস্থান করে। রাবী বলেন, একদা ইবন উমার (রা) বায়তুল্লাহ অথবা বলেছেন কা'বার দিকে তাকিয়ে বলেছেন, তুমি কতই না ব্যাপক ও বিশাল মর্যাদার অধিকারী। তবে আল্লাহর কাছে মুমিন ব্যক্তির সম্মান ও মর্যাদা তোমার চেয়েও অধিক"।[১০]

عَنْ عبدالله بن عمر أنَّ رَسولَ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ قالَ: المُسْلِمُ أخُو المُسْلِمِ لا يَظْلِمُهُ ولَا يُسْلِمُهُ، ومَن كانَ في حَاجَةِ أخِيهِ كانَ اللَّهُ في حَاجَتِهِ، ومَن فَرَّجَ عن مُسْلِمٍ كُرْبَةً، فَرَّجَ اللَّهُ عنْه كُرْبَةً مِن كُرُبَاتِ يَومِ القِيَامَةِ، ومَن سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ يَومَ القِيَامَةِ.

আবদুল্লাহ ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "একজন মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে তার প্রতি যুলম করবে না এবং তাকে (শত্রুর কাছে) ন্যস্ত করবে না। আর যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে ব্যাপৃত থাকবে আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করবেন। আর যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের বিপদ দূর করবে আল্লাহ কিয়ামতের দিন তার বিপদ দূর করবেন। যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের দোষ গোপন রাখবে আল্লাহও কিয়ামতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন"।[১১] সুতরাং কারো দোষ সন্ধানে প্রবৃত্ত হওয়া একান্তভাবে অর্থহীন কাজ। কজেই তা থেকে বিরত থাকতে হবে।

---

৯. ৪৯-সূরা আল-হুজুরাত: ১২

১০. তিরমিযী, আবওয়াবুল বির্‌র ওয়াস-সিলাহ, বাব: মা জাআ ফী তা'যীমুল মুমিন, নং-২১৬৪

১১. বুখারী, কিতাবুয যুলম, বাব: লা ইয়াযলিমুল মুসলিমুল মুসলিমু ওয়ালা ইউসলিম, নং ২৪৪২

(৫) অধিক প্রশ্ন করা

জ্ঞান আহরণের জন্য প্রশ্ন করা দূষণীয় নয়, বরং তা প্রত্যাশিত। তবে মনে রাখতে হবে, অবাঞ্ছিত প্রশ্ন করা কিংবা কাউকে বেকায়দায় ফেলার চেষ্টা করা অর্থহীন কাজ। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَسْأَلُوا عَنْ أَشْيَاءَ إِنْ تُبْدَ لَكُمْ تَسُؤْكُمْ.

"হে মুমিনগণ! তোমরা সেসব বিষয়ে প্রশ্ন করো না, যা তোমাদের নিকট প্রকাশিত হলে তা তোমাদের কষ্ট দিবে"...।[১২]

عَنْ أَنَس بْن مَالِكٍ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « لَنْ يَبْرَحَ النَّاسُ يَتَسَاءَلُونَ حَتَّى يَقُولُوا هَذَا اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَىْءٍ فَمَنْ خَلَقَ اللَّهَ » .

আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "লোকজন একে অপরকে প্রশ্ন করে, এমনকি তারা বলে, এই আল্লাহ তো সব কিছু সৃষ্টি করেছেন, কিন্তু কে আল্লাহকে সৃষ্টি করেছে"?[১৩] হাদীসে যে ধরনের প্রশ্নের কথা বলা হয়েছে তা একান্তভাবে অর্থহীন। সুতরাং এধরনের প্রশ্ন করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

(৬) গাল-মন্দ করা

আমাদের সমাজে এমন কিছু সংখ্যক লোক রয়েছে যারা কথায় কথায় মানুষকে অশ্রাব্য ভাষায় গাল-মন্দ করে এবং তা অপরের নিকট বলে নিজেদের কৃতিত্ব জাহির করে। অথচ মানুষকে গাল-মন্দ করা নিঃসন্দেহে অত্যন্ত গর্হিত ও অর্থহীন কাজ। এর ফলে মানবসমাজে বৈরিতার আগুন ছড়িয়ে পড়ে। মহান আল্লাহ বলেন,

وَلَا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الِاسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ –

"এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করবে না এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকো না। ঈমানের পর মন্দ নাম অতি মন্দ। যারা তাওবা করবে না তারাই যালিম"।[১৪]

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ « سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "মুসলিমকে গালমন্দ করা ফাসিকী কাজ এবং তাকে হত্যা করা কুফরী"।[১৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ – ﷺ – قَالَ « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لأَخِيهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهِ أَحَدُهُمَا » .

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "কোনো ব্যক্তি তার ভাইকে 'হে কাফির' বললে তা তাদের দুজনের একজনের ওপর বর্তাবে" (অর্থাৎ

---

১২. ৫-সূরা আল-মায়িদা: ১০১-১০২

১৩. বুখারী, কিতাবুল ই'তিসাম, বাব: মা ইউকরাহু মিন কাসরাতিস-সুওয়াল..., নং ৭২৯৬

১৪. ৪৯-সূরা আল-হুজুরাত: ১১

১৫. বুখারী, কিতাবুল ঈমান, বাব: খাওফুল মুমিন..., নং ৪৮

তাদের একজন কাফির সাব্যস্ত হবে)।[১৬] উল্লেখ্য, দুর্ভাগ্যজনকভাবে লক্ষ করা যায়, কিছু সংখ্যক আলিম তার চিন্তাধারার (মাসলাকের) বিপরীত আলিমকে কথায় কথায় কাফির ফাতওয়া দেন। আমাদের মনে রাখতে হবে, এধরনের আচরণ কোনোভাবে দীনের খিদমত নয়, বরং যেকোনো বিচারে তা অর্থহীন কাজ।

(৭) অনর্থক কথা বলা

লোকজন কোথাও বসলে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সহসা লাগামহীন অনর্থক কথা-বার্তায় প্রবৃত্ত হয়। অথচ আমরা যা বলি কিংবা করি মহান আল্লাহর নিকট সবগুলোর পুঙখানুপুঙ্খ হিসেব দিতে হবে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন,

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ .

"মানুষ যে কথাই উচ্চারণ করে তার জন্য তৎপর প্রহরী তার নিকটেই রয়েছে"।[১৭]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ – ﷺ – قَالَ « إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ رِضْوَانِ اللَّهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً ، يَرْفَعُ اللَّهُ بِهَا دَرَجَاتٍ ، وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً يَهْوِى بِهَا فِى جَهَنَّمَ » .

আবূ হুরায়রা (রা) সূত্রে নবী (সা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "বান্দা কখনো কখনো আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য এমন কথা বলে যে বিষয়ে তার কোনো ধারণাই থাকে না। এর ফলে আল্লাহ তার মর্যাদা বৃদ্ধি করেন। আবার বান্দা কখনো আল্লাহর অসন্তুষ্টির কথা বলে,যার পরিণাম সম্পর্কে সে অসচেতন থাকে। এর ফলে সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে"।[১৮]

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ تُوُفِّىَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ فَقَالَ يَعْنِى رَجُلٌ أَبْشِرْ بِالْجَنَّةِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ –ﷺ– أَوَلاَ تَدْرِى فَلَعَلَّهُ تَكَلَّمَ فِيمَا لاَ يَعْنِيهِ أَوْ بَخِلَ بِمَا لاَ يَنْقُصُهُ ».

আনাস ইবন মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "নবী (সা) এর এক সাহাবী মৃত্যুবরণ করলে এক ব্যক্তি বললো, লোকটিকে জান্নাতের সুসংবাদ দিন। তখন রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, তুমি কি জানো না, হয়ত সে অর্থহীন কথা বলেছে অথবা যা দান করলে তার কোনো ক্ষতি হতো না অথচ সে তাতে কৃপণতা করেছে"।[১৯]

وَعَن ابنِ عُمَر رضي الله عنْهُمَا قَالَ: قَالَ رسُولُ اللهِ ﷺ: لا تُكْثِرُوا الكَلامَ بغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ، فَإِنَّ كَثْرَة الكَلامِ بِغَيْرِ ذِكْرِ اللهِ تَعالَى قَسْوةٌ لِلْقَلْبِ، وإِنَّ أَبْعَدَ النَّاسِ مِنَ اللهِ القَلبُ القَاسي. رواه الترمذي.

ইবন উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "তোমরা আল্লাহর যিকির ছাড়া অন্য কোনো কথা অধিক বলবে না। কারণ আল্লাহর যিকির ব্যতীত অধিক কথায় অন্তর কঠিন হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তির অন্তর কঠিন, সে মানুষের সাহচর্য থেকে দূরে সরে যায়"।[২০]

---

১৬. বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাব: মান কাফ্ফারা আখাহু বি-গাইরি তা'বীলিন ফা-হুয়া কামা কলা, নং-৬১০৩

১৭. ৫০-সূরা কাফ: ১৭

১৮. বুখারী, কিতাবুর রিকাক, বাব: হিফযুল লিসান, নং-৬৪৭৮

১৯. তিরমিযী, আবওয়াবুয যুহ্দ, বাব: মিন হুসনি ইসলামিল মারয়ি মা-লা ইয়ানিহি, নং-২৪৮৬

২০. তিরমিযী, কিতাবুয যুহ্দ, বাব: আন-নাহিউ 'আন কাসরাতিল কালামি ইল্লা বি-যিকরিল্লাহি, নং-২৫৯৩

আমাদের মনে রাখতে হবে, অনর্থক কথায় অন্তর শক্ত হয়ে যায় এবং এর ফলে মানুষ তার করণীয় বর্জনীয় বিষয়ে বোঝার শক্তি হারিয়ে ফেলে। সুতরাং এধরনের অর্থহীন কাজ থেকে বিরত থাকা একান্তভাবে বঞ্ছনীয়।

(৮) অভিশাপ দেয়া

কাউকে অভিশাপ দেয়া কিংবা কারো ধ্বংস কামনা করা নিঃসন্দেহে অর্থহীন কাজ। যেমন-

عَنْ أَبِى الدَّرْدَاءِ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ –ﷺ– يَقُولُ « إِنَّ اللَّعَّانِينَ لاَ يَكُونُونَ شُهَدَاءَ وَلاَ شُفَعَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

আবুদ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (সা) কে বলতে শুনেছি, "অধিক লা'নতকারী কিয়ামতের দিন কারো পক্ষে সাক্ষী কিংবা সুপারিশকারী হতে পারবে না"।[২১] লা'নতকারীর সুপারিশ মহান আল্লাহর নিকট অগ্রহণযোগ্য। সুতরাং লা'নত করাও এক ধরনের অর্থহীন কাজ।

(৯) চোগলখুরী করা

চোগলখুরী বলতে একজনের কথা অপরের কাছে লাগিয়ে স্বাভাবিক পরিবেশ নষ্ট করা বোঝায়। এর ফলে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক বিনষ্ট হয়।কাজেই তা অনর্থক কাজ। মহান আল্লাহ বলেন,

هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِيمٍ – مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ . عُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ . أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ –

"পেছনে নিন্দাকারী, যে একের কথা অপরের নিকট লাগায়। যে ব্যক্তি কল্যাণকর কাজে বাধা দান করে, যে সীমালঙ্ঘনকারী, পাপিষ্ঠ, রূঢ় স্বভাব এবং তদুপরি কুখ্যাত; এজন্য যে, সে ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে সমৃদ্ধশালী"।[২২]

عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ – رضى الله عنه – قَالَ قَالَ النَّبِىُّ – ﷺ – « تَجِدُ مِنْ شَرِّ النَّاسِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ اللَّهِ ذَا الْوَجْهَيْنِ ، الَّذِى يَأْتِى هَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ وَهَؤُلاَءِ بِوَجْهٍ » .

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী (সা) বলেছেন, "কিয়ামতের তোমরা ঐ ব্যক্তিকে নিকৃষ্ট লোক হিসেবে পাবে, যে ব্যক্তি দুই চেহারা বিশিষ্ট। সে এক চোহারা নিয়ে এদের কাছে আসে এবং আরেক চেহারা নিয়ে তাদের কাছে আসে"।[২৩]

عَنْ حُذَيْفَةُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ – ﷺ – يَقُولُ « لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَتَّاتٌ » .

হুযায়ফা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী (সা) কে বলতে শুনেছি, "চোগলখোর জান্নাতে প্রবেশ করবে না"।[২৪]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, চোগলখুরী যেহেতু জান্নাত লাভের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক। সুতরাং এধরনের অনর্থক কাজ যেকোনো মূল্যে পরিহার করতে হবে।

---

২১. মুসলিম, কিতাবুল বিররি ওয়াস-সিলাতি ওয়াল আদাব, বাব: আন-নাহইউ 'আনিল লা'নিদ-দাব্বাতি ওয়া গাইরহা, নং ৬৭৭৭

২২. ৬৮-সূরা আল-কালাম : ১১-১৪

২৩. বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাব: মা কীলা ফী যিল-ওয়াজহাইন, নং ৬০৫৮

২৪. বুখারী, কিতাবুল আদাব, বাব: মা ইউকরাহু 'আনিন-নামীমাহ, নং ৬০৫৬

(১০) প্রতারণা করা

কাউকে ঠকানো, বিভ্রান্ত করা কিংবা ক্ষতিগ্রস্ত করা ইসলামে অগ্রহণযোগ্য। এসব কাজ অর্থহীন এবং তা মুনাফিকের কাজ, মুমিনের কাজ নয়। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ . يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنْفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ .

"এবং মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা বলে, আমরা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছি। কিন্তু তারা মুমিন নয়। তারা আল্লাহ এবং মুমিনদেরকে প্রতারিত করতে চায়। অথচ তারা যে নিজেদের ছাড়া অপর কাউকে প্রতারিত করতে করে না,তা তারা বোঝতে পারে না"।[২৫]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ. أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –ﷺ– مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيهَا فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً فَقَالَ « مَا هَذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ». قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ « أَفَلاَ جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ كَىْ يَرَاهُ النَّاسُ مَنْ غَشَّ فَلَيْسَ مِنِّى.

আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত। "একদা রাসূলুল্লাহ (সা) একটি খাদ্য-স্তুপের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি তাতে হাত ঢুকিয়ে তার আঙুলে স্যাতস্যাতে ভাব অনুভব করেন। তখন তিনি বলেন, হে খাদ্য-স্তুপের মালিক! একি? সে বললো, হে আল্লাহর রাসূল! আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিলো। তিনি বলেন, তবে তুমি তা স্তুপের উপরে রাখলে না কেনো,যাতে লোকজন তা দেখে নিতে পারতো? (অতঃপর) তিনি বলেন, যে প্রতারণা করে সে আমার (উম্মাতের) অন্তর্ভুক্ত নয়"।[২৬]

উপরোক্ত আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, প্রতারণা করা অর্থহীন কাজ।

(১১) অধিকারে হস্তক্ষেপ করা

প্রত্যেক মানুষের কিছু না কিছু অধিকার আছে। আর এই অধিকার আদায়ের ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে ব্যাপক নির্দেশনা রয়েছে। এতদসত্ত্বেও মানুষকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সাময়িক সুবিধা নেয়া নৈতিকতার দিক থেকে অর্থহীন কাজ।

মহান আল্লাহ বলেন,

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ –

"এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। তোমরা তা লঙ্ঘন করো না। যারা এসব সীমারেখা লঙ্ঘন করে তারাই যালিম"।[২৭]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ –ﷺ– قَالَ « مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِينِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ

---

২৫. ২-সূরা আল-বাকারা: ৮-৯

২৬. মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব: কওলুন-নাবী স. মান গাশ্শানা ফা-লাইসা মিন্না, নং ২৯৫

২৭. ২-সূরা আল-বাকারা: ২২৯

اللَّهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ ». فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيرًا يَا رَسُولَ اللَّهِ قَالَ « وَإِنْ قَضِيبًا مِنْ أَرَاكٍ.

আবূ উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "যে ব্যক্তি কোনো মুসলিমের অধিকার হরণ করবে আল্লাহ তার জন্য জাহান্নাম অবধারিত করে দিবেন এবং জান্নাত হারাম করে দিবেন। এক ব্যক্তি বললো, হে আল্লাহর রাসূল! নগণ্য বস্তু হলেও? তিনি বলেন, পিলু গাছের একটি অকেজো ডাল হলেও"।[২৮]

উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, কাউকে তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে সাময়িকভাবে কিছু লাভ করা গেলেও বুদ্ধিমত্তার বিচারে অর্থহীন কাজ।

(১২) উপহাস করা

উপহাস ও ঠাট্টা-বিদ্রূপের সূচনা ঘটে নিজেকে অপরের চেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং অপরকে নিজের চেয়ে তুচ্ছজ্ঞান করা থেকে। অথচ এধরনের আচরণ কোনোভাবে শোভন নয়। বরং তা অর্থহীন কাজ। মহান আল্লাহ বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَى أَنْ يَكُونُوا خَيْرًا مِنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِنْ نِسَاءٍ عَسَى أَنْ يَكُنَّ خَيْرًا مِنْهُنَّ .

"হে মুমিনগণ! কোনো পুরুষ যেনো অপর কোনো পুরুষকে উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে। কোনো নারী যেনো অপর কোনো নারীকেও উপহাস না করে। কেননা যাকে উপহাস করা হয় সে উপহাসকারিনী অপেক্ষা উত্তম হতে পারে"...।[২৯]

عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " إِنَّ الْمُسْتَهْزِئِينَ بِالنَّاسِ يُفْتَحُ لِأَحَدِهِمْ بَابٌ فِي الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلُمَّ هَلُمَّ، فَيَجِيءُ بِكَرْبِهِ وَغَمِّهِ، وَإِذَا جَاءَ أُغْلِقَ دُونَهُ فَمَا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى إِنَّ أَحَدَهُمْ يُفْتَحُ لَهُ الْبَابُ مِنْ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَيُقَالُ لَهُ: هَلُمَّ فَمَا يَأْتِيهِ مِنَ الْإِيَاسِ"

আল-হাসান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, "লোকজনের প্রতি বিদ্রূপকারীর জন্য কিয়ামতের দিন জান্নাতের একটি দরজা উন্মুক্ত করা হবে এবং তাকে বলা হবে, এসো, এসো। অতঃপর সে কষ্ট করে এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় আসবে। সে সেখানে পৌঁছামাত্র তার সামনে দরজ বন্ধ করে দেয়া হবে। অতঃপর দ্বিতীয়বার দরজা খুলে বলা হবে, এসো, এসো। অতঃপর সে কষ্ট করে এবং দুশ্চিন্তাগ্রস্ত অবস্থায় আসবে। সে সেখানে পৌঁছামাত্র তার সামনে দরজ বন্ধ করে দেয়া

---

২৮. মুসলিম, কিতাবুল ঈমান, বাব: ওয়ায়িদু মানিকতা'আ হাক্কু মুসলিমিন বি-ইয়ামীনিন, নং ৩৭০

২৯. ৪৯-সূরা আল-হুজরাত : ১১

হবে। এ ঘটনা পরম্পরা অব্যাহত থাকবে। এমনকি এক সময় তার জন্য দরজা খুলে বলা হবে, এসো। এসময় সে নৈরাশ্যের কারণে সেদিকে যেতে এবং জান্নাতে প্রবেশের সাহসই পাবে না"।[৩০]

(১৩) অপবাদ দেয়া

জেনেশুনে নিজের ভাইকে অপরাধী সাব্যস্ত করা কিংবা যে কাজ সে করেনি, তার প্রতি তা আরোপ করাই অপবাদ। এটি নিঃসন্দেহে পাপ কাজ এবং অনর্থক কাজ তো বটেই। মহান আল্লাহ বলেন,

وَمَنْ يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا.

"কেউ কোনো দোষ বা পাপ করার পর তা কোনো নির্দোষ ব্যক্তির প্রতি আরোপ করলে সে তো মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে"।[৩১] কাজেই সর্ববিধ অপবাদ আরোপ থেকে বিরত থাকতে হবে। অপবাদ আরোপ নিঃসন্দেহে এক ধরনের অনর্থক কাজ।

(১৪) খেলাধুলায় মত্ত থাকা

খেলাধুলা বলতে শরীরচর্চা বুঝালে তা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয়। কিন্তু খেলাধুলার নামে যেসব বিনোদন ইবাদতে গাফলতি সৃষ্টি করে এবং পারস্পরিক সম্পর্কে অবনতি ঘটায় কুরআন মাজীদে এধরনের কাজকে 'লাহওয়াল হাদীস (অসার বাক্য,অনর্থক কথাবার্তা) বলা হয়েছে (৩১ : ৬)। ইসলামী শরী'আতে তা অর্থহীন কাজ এবং তা নিষিদ্ধও বটে। মহান আল্লাহ বলেন-

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون.

"হে মুমিনগণ! মদ, জুয়া, মূর্তি পূজার বেদী ও ভাগ্য নির্ণায়ক শর ঘৃণ্য বস্তু, শয়তানের কাজ। সুতরাং তোমরা তা বর্জন করো-যাতে তোমরা সফলকাম হতে পারো"।[৩২]

অনর্থক কাজকর্ম থেকে বাঁচার উপায়-

১. পরিকল্পিতভাবে সময়ের সদ্ব্যবহার করা

২. নিজেকে সর্বদা আল্লাহর স্মরণে ব্যস্ত থাকা

৩. ভালো কাজে সময় ব্যয় করা

৪. ভালো বন্ধু-বান্ধব বেছে নেয়া

৫. আখিরাতের জবাবদিহিতার চেতনা অন্তরে দৃঢ়ভাবে বদ্ধমূল রাখা।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সর্বধরনের অনর্থক বিষয়াবলী থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দিন। আমীন।

অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ ছাইদুল হক

---

৩০. আল-বায়হাকী-শু'আবুল ঈমান, নং ৬৩৩৩

৩১. ৪-সূরা আন-নিসা: ১১২

৩২. ৫-সূরা আল-মায়িদা : ৯০-৯১

মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ এবং জাতীয় সংহতি

আবুল আসাদ

উনিশ শ' একাত্তরে ২৫ মার্চ-উত্তর মুক্তিযুদ্ধে একটা বিষয় একেবারে নিশ্চিত ছিল, বাংলাদেশের স্বাধীনতা নিয়ে তখন কারো মধ্যে কোন মতদ্বৈততা ছিল না, মতদ্বৈততা ছিল মুক্তিযুদ্ধের ব্যবস্থা ও অবস্থা নিয়ে। যারা মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতা করেছিল, তাদের মনে ছিল স্বাধীনতা রক্ষার উদ্যোগ, আবার যারা মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিল, তাদেরও মনে ছিল স্বাধীনতাকে নিরঙ্কুশ করার প্রাণপণ ইচ্ছা। ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ পরবর্তী সময়ে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের (অবজারভার গ্রুপের মালিক হামিদুল হক চৌধুরী, পিডিপির নুরুল আমিন, জামায়াতের অধ্যাপক গোলাম আযম কনভেনশন মুসলিম লীগের ফজলুল কাদের চৌধুরী, মুসলিম লীগের খানে সবুর এবং নেজামে ইসলামসহ বিভিন্ন দল ও গ্রুপের) মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কিত বক্তব্য এবং মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আওয়ামী লীগের বক্তব্যসহ ১৯৭১ সালের ১০ এপ্রিল ঘোষিত স্বাধীনতা সনদের কথা যদি পর্যালোচনা করে দেখা হয়, তাহলে দুইটি বড় বিষয় পাওয়া যাবে। এক. মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী পক্ষ, মুক্তিযুদ্ধকে ভারতের ষড়যন্ত্র ও স্বাধীনতা ধ্বংসকারী হিসেবে চিহ্নিত করেছে, দুই. মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণকারীরা মুক্তিযুদ্ধকে স্বাধীনতা উদ্ধারকারী এবং ভারতীয় সাহায্যকে অপরিহার্য হিসেবে দেখেছে।

জাতীয় মনের এই আত্মঘাতী বিভক্তি তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের অবিসংবাদিত নেতা হয়ে উঠা শেখ মুজিবুর রহমান চেষ্টা করলে জোড়া লাগাতে পারতেন। সবার সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নেয়ার কথা তিনি বলেছিলেনও। ১৯৭১ সালের ১ মার্চ জাতীয় পরিষদের অধিবেশন মুলতবি হওয়ার পর হোটেল পূর্বানীতে তাড়াহুড়া করে আহুত সাংবাদিক সম্মেলনে এক প্রশ্নের জবাবে শেখ মুজিব বলেন যে, বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে মাওলানা ভাসানী, জনাব নুরুল আমিন, জনাব আতাউর রহমানসহ প্রদেশের অন্যান্য নেতৃবৃন্দের সাথে আলাপ-আলোচনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। (দৈনিক সংগ্রাম, ২ মার্চ ১৯৭১)। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান তার এ মহৎ সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছেন তার কোন প্রমাণ পাওয়া যায়নি। শেখ সাহেবের একলা চলো নীতি এর কারণ। স্মর্তব্য, ১৯৬৯ সালের গণঅভ্যুত্থানের ফল একা কুক্ষিগত করে সবাইকে বাদ দিয়ে আওয়ামীলীগ যেমন একাই সামনে এগিয়ে গিয়েছিল, ঠিক তেমনিভাবে অসহযোগ আন্দোলনের ফল ভোগে সে কাউকেই শরিক করতে চায়নি। যেন সে নিশ্চিত ছিল ক্ষমতা হস্তান্তর হচ্ছে এবং আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় যাচ্ছে। এ না হয়ে স্বাধীনতা ও মুক্তিযুদ্ধের চিন্তা যদি তার মাথায় থাকতো, তাহলে আসন্ন মুক্তিযুদ্ধ বা স্বাধীনতা যুদ্ধের জন্য আওয়ামী লীগের এই মানসিকতা ছিল অযৌক্তিক, অনুপযুক্ত ও ক্ষতিকর। (আওয়ামী লীগের অনুমোদন না পেলে কেউ মুক্তিবাহিনীতে যোগ দিতে পারেনি এবং

আওয়ামী লীগ পরিচয় না দিলে কেউ ভারত সীমান্ত পার হতে পারেনি।) সবাই জানেন, সব রাজনৈতিক দল ও দেশের মানুষকে, এমনকি তার দলের নেতা কর্মীদের চরম অনিশ্চয়তা ও অন্ধকারে রেখে শেখ মুজিব পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর হাতে নিজেকে তুলে দেন। অন্যদিকে শেখ মুজিবের বিনা অনুমতিতে এবং এমনকি তার আদেশ লংঘন করে আওয়ামী লীগের শীর্ষ নেতারা নিজ সিদ্ধান্তে ভারত চলে যান এবং ভারতের সাহায্য-সহযোগিতায় মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রবাসী সরকার গঠন করেন। শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের এসব একক ও আকস্মিক সিদ্ধান্ত অন্য সব দল ও নেতৃবৃন্দের কাছে রহস্যপূর্ণ ও সন্দেহজনক মনে হয়েছে। যা মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে জাতির মত-বিভক্তির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দুঃখজনক হল, যিনি জাতির মত-বিভক্তি দূর করতে পারতেন তিনিই মত-বিভক্তি উসকে দেয়ার ব্যবস্থা করেন। দেশের কোটি কোটি মানুষকে পাকবাহিনীর বন্দুকের মুখে রেখে কিংকর্তব্যবিমুঢ় আওয়ামীলীগরা ভারতের আশ্রয়ে যান। ঘরে ঘরে দুর্গ গড়ে তোলার মতো নানা আসফালন তারা করেছেন, কিন্তু দেশবাসীকে রক্ষার কোন ব্যবস্থাই তারা করেননি। স্বাধীনতা ঘোষণা করেছেন সেনাবাহিনীর একজন মেজর অপরিকল্পিতভাবে, বাঙালি সৈনিকরা স্বাধীনতা শুরু করেছেন, তাও অপরিকল্পিতভাবে। এর সাথে আওয়ামী লীগের কোন সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু সব কৃতিত্ব তারাই কুক্ষিগত করেছেন বৃহৎ ভারতের আশ্রয়ে থেকে।

মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে জাতির মত-বিভক্তি নিমিত্ত যেমন শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগ, তেমনি মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশ জাতীয় সংহতির পথে বাধা সৃষ্টি করেছে আওয়ামী লীগ, তার দোসর এবং বাংলাদেশকে স্বাধীনতা দান করার দাবিদার ভারত। মুক্তিযুদ্ধ হয়েছে ১৯৭১ সালে। তার অর্ধ শতকেরও বেশি সময় পার হয়ে গেলেও কিন্তু এখনো মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ নিয়ে জাতিকে বিভক্ত করার অপচেষ্টা জিইঁয়ে রাখা হয়েছে। এর সাথে অবশ্যই প্রতিবেশী বড় দেশ ভারতের রাজনৈতিক স্বার্থ জড়িত রয়েছে এবং তারাই আমাদের জাতীয় সংহতির পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। এমন ঘটনা পৃথিবীর আর কোথাও ঘটেনি। অনেক দেশে রক্তক্ষয়ী সিভিল ওয়ার হয়েছে, একদেশে দুই গ্রুপের মধ্যে বছরের পর বছর ধরে যুদ্ধ চলেছে। যুদ্ধ শেষেই তাদের মধ্যে সংহতির প্রতিষ্ঠা হয়েছে, দেশ তাদের সমৃদ্ধ হয়েছে। যুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষের পরস্পর বিরোধী চর্চা নিয়ে তারা বসে থাকেনি। আমাদের অতি কাছের দেশ ভিয়েতনাম একট দৃষ্টান্ত হতে পারে। দক্ষিণ ভিয়েতনাম এবং তার মিত্রদের সাথে উত্তর ভিয়েতনামের যুদ্ধ চলে ২০ বছর। যুদ্ধের এই ২০ বছরে দক্ষিণ ভিয়েতনামের মিত্র মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে ৪৫ লাখ টন বোমা ফেলে, ১০ লাখ লোক হত্যা করে, ১৪০০ গ্রাম ধ্বংস করে এবং খাদ্য উৎপাদন বন্ধ করার জন্য রাসায়নিক অস্ত্র ব্যবহার করে। যুদ্ধ শেষ হয় ৩০ এপ্রিল ১৯৭৫ সালে। যুদ্ধের পর উত্তর ও দক্ষিণ ভিয়েতনামের মধ্যে জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠায় খুব বেশি দেরি হয়নি। ভিয়েতনাম এখন এশিয়ার শক্তিশালী ও সমৃদ্ধ দেশ। যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামে ৪৫ লাখ টন বোমা ফেলেছে, ১০ লাখ লোক হত্যা করেছে, পুড়িয়ে দিয়েছিল ১৪০০ ভিয়েতনামী গ্রাম, সেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিয়েতনামের এখন

সবচেয়ে বড় মিত্র। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের গৃহযুদ্ধের কথা এখানে তোলা যায়। এই গৃহযুদ্ধ চলেছিল চার বছর (১৮৬১-১৮৬৫)। গৃহযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ ছিল উত্তরের ঐক্যপন্থী এবং দক্ষিণের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা। যুদ্ধে দক্ষিণের বিচ্ছিন্নতাবাদীরা হেরেছিল, জয় পেয়েছিল ঐক্যপন্থীরা। ক্ষয়ক্ষতি ছিল ভয়াবহ। যুদ্ধ ও যুদ্ধসংশ্লিষ্ট ঘটনায় মোট মারা যায় ১৬ লাখ ৯২ হাজার। এর মধ্যে দক্ষিণের ছিল ৮ লাখ ৬৪ হাজার এবং উত্তরের সংখ্যা ছিল ৮ লাখ ২৮ হাজার। যুদ্ধের চার বছরে যুদ্ধজনিত কারণে ক্রীতদাস ও দাসীদের মৃত্যুবরণ করা ১০ লাখ ৬০ হাজার সংখ্যা যদি যোগ করা হয়, তাহলে চার বছরে আমেরিকান গৃহযুদ্ধে নিহতের মোট সংখ্যা দাঁড়ায় ২৭ লাখ ৫২ হাজার। এই ক্ষতির সাথে বিষয়-সম্পত্তির ক্ষতি যদি শামিল করা যায়, তাহলে যুদ্ধজনিত ক্ষতির পরিমাণ দাঁড়ায় অকল্পনীয় এক সংখ্যা। জীবন ও সম্পদের এই ভয়াবহ ক্ষতির জন্য বিচ্ছিন্নতাবাদী দক্ষিণকে দায়ী করে শতবর্ষ ধরে কিন্তু পক্ষ-বিপক্ষের গান গাওয়া হয়নি। যুদ্ধ বন্ধ হওয়ার সাথে সাথেই জাতীয় সংহতির ঘোষণা দেয়া হয়। বলা হয়, যারা অস্ত্র ত্যাগ করবে, বাড়িতে ফিরে যাবে এবং নাগরিক জীবন যাপনে ব্রত হবে, তাদের সকলের জন্যই রাষ্ট্রের ক্ষমা এবং সবারই এক পরিচয় হবে- আমেরিকান। তারপর সকলে মিলেই আজকের সমৃদ্ধ আমেরিকা গড়ে তুলেছে।

কিন্তু বাংলাদেশে এ সংহতিকে আজ ৫৫ বছর ধরে বিতর্কের বিষয় হিসেবে রেখে দেয়া হয়েছে। অথচ সময়, ক্ষতি ও সংঘাতের বিচারে ভিয়েতনাম ও আমেরিকান সিভিল ওয়ারের সাথে আমাদের কোন তুলনাই চলতে পারে না। মুক্তিযুদ্ধের সাথে দ্বিমত পোষণকারী এদেশীয় পক্ষ প্রকৃতপক্ষে অস্ত্রের যুদ্ধ করেনি বাক যুদ্ধ করেছে। হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগের ইত্যাদির মত বড় অপরাধের সাথে তারা বলা যায় জড়িত-ই ছিল না। (যুদ্ধাপরাধীদের ১৯৫ জনের যে তালিকা, তার মধ্যে একজনও বাংলাদেশী ছিল না। রাজাকারও ছিলনা একজনও)। স্বাধীনতা উত্তর দালাল আইনের অধীনে যাদের ধরা হয়েছিল, তাদের বিরুদ্ধে আনিত অভিযোগ পর্যালোচনা করলেও এটাই দেখা যায়। ১৯৭২ সালের ২৪ জানুয়ারি ঘোষিত দালাল আইনে প্রায় এক লাখ লোককে গ্রেফতার করা হয়। এদের মধ্য থেকে অভিযোগ আনা হয় ৩৭ হাজার ৪৭১ জনের বিরুদ্ধে। এই অভিযুক্তদের মধ্যে ৩৪ হাজার ৬২৩ জনের বিরুদ্ধে সাক্ষী প্রমাণের অভাবে কোন মামলা দায়েরই সম্ভব হয়নি। ২ হাজার ৮ শত ৪৮ জন বিচারে সোফর্দ হয়। বিচারে ৭ শত ৫২ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ প্রমাণিত হয় এবং অবশিষ্ট ২ হাজার ৯৬ জন বেকসুর খালাস পেয়ে যায়। বিচারে যাদের সাজা হয় তাদেরও অপরাধ ছিল ছোট-খাটো ধরনের।

মুক্তিযুদ্ধকালে মুক্তিযুদ্ধের সাথে দ্বিমত পোষণকারীদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ, অপরাধ ও শাস্তির উপরোক্ত চিত্রের দিকে দৃষ্টিপাত করলে এ বিষয়টি একদম স্পষ্ট হয়ে যায় যে, মুক্তিযুদ্ধে তাদের বিরোধিতা ছিল একেবারেই রাজনৈতিক, অপরাধমূলক নয়। জামায়াতে ইসলামীকে মুক্তিযুদ্ধের এক নম্বর বিপক্ষ শক্তি ধরা হয়, যদিও কথাটা একদমই অসত্য। সেই সময় মুসলিম লীগ তিন ভাবে বিভক্ত থাকলেও মুসলিম লীগই ছিল বড় দল, যাদের কর্মী সমর্থক ছিল গ্রাম পর্যায়ে পর্যন্ত। ফজলুল কাদের চৌধুরী,

খান. এ. সবুরসহ বড় বড় নেতা ছিল মুসলিম লীগের, যা অন্য কোন দলে ছিল না। এছাড়া ছিল নুরুল আমিনের পি.ডি.পি। নেজামে ইসলামসহ আরো দল তখন ছিল। সেই তুলনায় জামায়াতে ইসলামী ছিল ছোট দল। কিছু পকেট ছাড়া গোটা দেশে তাদের সংগঠন ছিল না। তবুও মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতার দায় জামায়াতের ঘাড়েই চাপে। এর কারণ হলো, সত্তরের নির্বাচন এবং মুক্তিযুদ্ধ পাকিস্তান আমলের সব দলকেই প্রায় মুছে ফেলে। ফাঁকা মাঠে সব ঝড়ের চোট এসে জামায়াতের মাথায় লাগে। এছাড়া জামায়াতকে টার্গেট করার ক্ষেত্রে ভারতের যোগসাজসও কাজ করেছে। ভারত ইসলামকে ভয় করে। ইসলামকে ভয় করে বলেই ইসলামী দল জামায়াতকে ভয় করে। গান্ধী, নেহেরু এবং বিজেপির অখণ্ড ভারত গড়ার স্বপ্ন নিয়ে ভারত সামনে এগুচ্ছে। তার এই স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে একমাত্র বড় বাধা ইসলাম। এই বাধা দূর করতে হলে মুসলমানদের 'মুসলিম স্বাতন্ত্র চেতনা'র বিলুপ্তি ঘটাতে হবে। জামায়াতে ইসলামীর মত দল থাকা পর্যন্ত তা সম্ভব নয়। এই কারণেই রাজনীতির ময়দান থেকে জামায়াতকে সরিয়ে দেয়া, অন্ততপক্ষে দুর্বল করে রাখার জন্যই ভারত জামায়াতকে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি বানাচ্ছে এবং স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ বিভাজনকে জিইঁয়ে রেখে মুক্তিযুদ্ধে সহায়তাকারী হিসেবে বাংলাদেশে সে নিজেকে হাজির থাকতে চাচ্ছে। কিন্তু ভারত এবং বাংলাদেশে তাদের দোসররা সত্যের সাথে পেরে উঠছে না। মুক্তিযুদ্ধের সাথে দ্বিমত পোষণ ছিল একান্তভাবেই রাজনৈতিক, কোন দিক দিয়েই অপরাধমূলক নয়। ১৯৭২ সালের দালাল আইনে মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে যাদের অপরাধ সংঘটনকারী হিসেবে গ্রেফতার করা হয়, অপরাধী হিসেবে যাদের শাস্তি হয়, তাদের মধ্যে জামায়াতে ইসলামের কেউ ছিল না। জামায়াতে ইসলামীর উল্লেখযোগ্য কোন নেতাকর্মীর বিরুদ্ধে দেশের থানা বা আদালতে কোন মামলাও হয়নি। মোটামুটিভাবে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধীতাকারী অন্য দলগুলোর ব্যাপারেও এটাই ছিল সাধারণ চিত্র। এর পাশাপাশি শেখ মুজিব মুক্তিযুদ্ধকালে গণহত্যার তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে এটাই বুঝেছিলেন। এ কারণেই তথ্যানুসন্ধান তিনি স্থগিত করেছিলেন এবং সংগৃহীত তথ্য ধামাচাপা দেয়া হয়েছিল।

এই অবস্থায় অন্য অনেকের মত শেখ মুজিব জাতীয় সংহতি রক্ষা, মুক্তিযুদ্ধের পক্ষ-বিপক্ষ বিভাজন মুছে ফেলার জন্য সাধারণ ক্ষমার প্রয়োজনীতা অনুভব করেছিলেন। এই প্রয়োজনের তাগিদেই ১৯৭৩ সালের ৩০ এপ্রিল হত্যা, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ, লুটপাট এই চার অপরাধে অপরাধী ছাড়া সকলের জন্য সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করেন। ক্ষমা ঘোষণার দিন থেকে ১৯৭৬ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত দুই বছরে উক্ত চার অপরাধে গোটা দেশে একটিও মামলা দায়ের হয়নি। এই অবস্থায় এই আইনটিও বাতিল হয়ে যায়।

জাতীয় সংহতি প্রতিষ্ঠার ব্যবস্থা শেখ মুজিবই সম্পূর্ণ করেছিলেন। আমলাতন্ত্রে তার নিয়োগ, ভারতের সাথে তার সম্পর্কের নীতি পর্যালোচনা করলেই এটা আরও স্পষ্ট হয়ে যায়। কিন্তু শেখ মুজিবের পর পরবর্তী অনেকের রাজনৈতিক দুর্বলতার সুযোগে ভারত আমাদের সংহতির অগ্রযাত্রাকে বাধাগ্রস্ত করে। শেখ হাসিনার দ্বিতীয় শাসনকালে ভারত

নগ্নভাবে আমাদের রাজনীতিতে জেঁকে বসে। দেশে যুদ্ধাপরাধী, মানবতাবিরোধী অপরাধী না থাকলেও শেখ হাসিনাকে মুক্তিযুদ্ধ কেন্দ্রিক মানবতাবিরোধী অপরাধের বিচার শুরু করতে ভারত বাধ্য করে। বিচার বিভাগ ও পুলিশ যদি হাতের মুঠোয় থাকে তাহলে সরকার চাইলে যে কোন কারো বিরুদ্ধে মামলা সাজাতে পারে। জামায়াতের শীর্ষ নেতৃবৃন্দের বিরুদ্ধে এইভাবে মামলা সাজানো হয়। মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক অপরাধে জামায়াত নেতাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ ও মামলা যে ছিল না, সাজানো মামলা দেখলেই তা বুঝা যায়। সাজানো মামলাতেই জামায়াতের পাঁচজন শীর্ষ নেতাকে ফাঁসি দেয়া হয়। আরো কয়েকজন শীর্ষ নেতার জেলেই মৃত্যু ঘটানো হয়। ভারত জামায়াতকে দিয়ে তার বাংলাদেশের ভারতীয় ইচ্ছার বিরোধী নেতাদের নির্মূল অভিযানের যাত্রা শুরু করলেও এ কাজ সে অন্তহীনভাবে সব দল, সব মানুষের বিরুদ্ধে চালু রাখতে চেয়েছিল বাংলাদেশকে সিকিম বানানোর আগ পর্যন্ত। কিন্তু আমাদের শিশু-কিশোরদের জুলাই অভ্যুত্থান শেখ হাসিনাকে দেশ ছেড়ে, ক্ষমতা ছেড়ে পালাতে বাধ্য করার মাধ্যমে ভারতের ষড়যন্ত্রে গুড়ে বালি দিয়েছে।

ফলে মুক্তিযুদ্ধের স্থপতি শেখ মুজিব জাতীয় সংহতির যে বীজ বপন করেছিলেন, স্বাধীনতা-উত্তর বহুদলীয় গণতন্ত্রের পুন:নির্মাতা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান যে সংহতির চারা গাছকে বড় করে তুলেছিলেন এবং সফল স্বৈরাচার ব্যবস্থার প্রবর্তক শেখ হাসিনা ভারতের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে যে জাতীয় সংহতিকে গলা টিপে মারার কাজ এগিয়ে নিয়েছিলেন, সে জাতীয় সংহতির অগ্রযাত্রার পথ জুলাই ২৪ -এর শিশু-কিশোর-যুব অভ্যুত্থানের মাধ্যমে আবার উন্মুক্ত হয়েছে। এখন শুধু প্রয়োজন নতুন কোন শেখ হাসিনার উত্থান না ঘটে তা নিশ্চিত করা। ক্ষমতা লিপ্সাই সবসময় শেখ হাসিনাদের আবির্ভাব ঘটায়। আমাদের রাজনীতিকদের কয়জন এই ক্ষমতা লিপ্সা থেকে মুক্ত? ভারত যদি কাউকে বা কোন দলকে ক্ষমতায় বসাতে এবং ক্ষমতায় রাখার জন্য যা করার তাই করতে চায়, তাহলে কয়জন রাজনীতিক ভারতের পায়ে পড়ার দাস মানসিকতা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারবেন?

আরো প্রশ্ন, আমাদের কতজন রাজনীতিক ও কয়টি রাজনৈতিক দল অবৈধভাবে ও ক্ষমতার জোরে ক্ষমতায় থাকার চাইতে পদত্যাগকে পছন্দ করবেন? আমরা অতীতে কোন মন্ত্রীকে স্বেচ্ছায় পদত্যাগ করতে দেখিনি, সরকারকে তো নাই। অথচ জাপান, ইউরোপ ও আমেরিকারসহ গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে এটা খুব সাধারণ চিত্র। এ কারণেই সেসব দেশে শেখ হাসিনাদের সৃষ্টি হয় না। জুলাই অভ্যুত্থানের শিশু-কিশোরদের নিঃস্বার্থ আত্ম-দান সামনে রেখে আমাদের সব মন্ত্রী ও সরকার জনগণের অভিযোগ ও দাবির মুখে এবং নিজের বিবেক ও আইনবিরোধী কাজ করে থাকলে নিজ ইচ্ছায় পদত্যাগ করে ক্ষমতা থেকে সরে আসবেন এটা নিশ্চিত করলে দেখবেন, আমাদের দেশেও আর শেখ হাসিনার সৃষ্টি হচ্ছে না। যদি আমরা তা পারি, তাহলে সেটাই হবে জুলাই অভ্যুত্থান ও জুলাই সনদ স্বাক্ষরের বড় সাফল্য। আর আমাদের এই রাজনীতিকদের দেশপ্রেম, সততা, সত্যনিষ্ঠাই রচনা করবে জাতীয় সংহতির সোনালি পথ। ■

৩০ নং পৃষ্ঠায়

মীম ট্যুরস বিজ্ঞাপন

মুসলিম উম্মাহর মৌলিক বৈশিষ্ট্য

ড. ইউসুফ আল কারযাভী

চারটি সুস্পষ্ট বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে মুসলিম উম্মাহ অন্যান্য জাতি থেকে আলাদা।

এক. আল্লাহমুখিতা

মুসলিমরা উৎস এবং গন্তব্য উভয় বিবেচনায় আল্লাহমুখী জাতি। এ জাতির উৎপত্তি আল্লাহর ওহির মাধ্যমে। মুসলিম জাতিকে আল্লাহপ্রদত্ত শিক্ষাদীক্ষা ও বিধিবিধান দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়েছে। তাদের দ্বীন এবং তাদের প্রতি আল্লাহর নিয়ামত পূর্ণ করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دينا...

"আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম এবং তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ পরিপূর্ণ করলাম। আর ইসলামকে তোমাদের দ্বীন মনোনীত করলাম।" (সূরা মায়িদা: ৩)

আল্লাহ তায়ালা স্বয়ং এ জাতির উদ্ভাবক। এ প্রসঙ্গে কুরআনে এসেছে-

وَكَذلِكَ جَعَلْنَكُمْ أُمَّةً وَسَطًا ...

"এভাবে আমি তোমাদের মধ্যপন্থি ন্যায়পরায়ণ জাতি করেছি।" (সূরা বাকারা: ১৪৩)

আয়াতে **جَعَلْنَكُمْ** শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এটার মানে হলো- আল্লাহ তায়ালাই মুসলিম জাতির উদ্ভাবক, বাছাইকারী বা কারিগর।

অপর এক আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ...

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ জাতি, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের বের করা হয়েছে।" (সূরা আলে ইমরান: ১১০)

আয়াতে ব্যবহৃত **اخرجت** শব্দটি বোঝাচ্ছে যে, এখানে কোনো এক সত্তা আছেন, যিনি মুসলিম জাতিকে বের করে নিয়ে এসেছেন। অর্থাৎ, এ জাতি নিজের খেয়াল-খুশি কিংবা যুগের বিবর্তনের ফলস্বরূপ আসেনি। কৃষকের রোপণ ও পরিচর্যা ছাড়া আগাছার মতো এটি জন্মায়নি; বরং মুসলিম জাতি গুরুত্বের সাথে কৃষকের পরিকল্পিত পরিচর্যার মাধ্যমে বেড়ে ওঠা বৃক্ষের অনুরূপ। আর যিনি এই উম্মাহকে বের করে নিয়ে এসেছেন এবং পরিচর্যা করেছেন কিংবা তাঁর বাণী ধারণ করার জন্য গঠন করেছেন, তিনি স্বয়ং আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা। সুতরাং, এই উম্মাহ উৎসগতভাবে রবমুখী। গন্তব্যের দিক থেকেও একইভাবে রবমুখী। কেননা, এই উম্মাহ আল্লাহর জন্য এবং আল্লাহর দাসত্ব ও আনুগত্যের মাঝেই নিজেদের জীবন কাটায়। জমিনে আল্লাহপ্রদত্ত বিধান

কায়েমের জন্য তারা প্রাণপাত করে। সুতরাং তারা আল্লাহ কাছ থেকে আগত এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তনকারী।[১]

যেমনটি আল্লাহ তায়ালার বাণীতে বলা হয়েছে,

قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِينَ .

"ঘোষণা দাও- আমার সালাত, আমার কুরবানি, আমার জীবন-মরণ জগৎসমূহের রব আল্লাহর উদ্দেশে নিবেদিত।" (সূরা আনআম: ১৬২)

দুই. মধ্যপন্থা

মুসলিম উম্মাহর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হলো মধ্যপন্থা। মধ্যপন্থা মুসলিম উম্মাহকে বিশ্ববাসীর শিক্ষকতার আসনে আসীন করেছে। সমগ্র মানবতার ওপর বাস্তব সাক্ষী হওয়ার উপযুক্ত করে তোলে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

وَ كَذٰلِكَ جَعَلْنٰكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَ يَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ...

"এভাবে আমি তোমাদের মধ্যপন্থি উম্মাহ করেছি, যেন তোমরা মানবতার ওপর সাক্ষী হও এবং রাসূল তোমাদের জন্য সাক্ষী হন।" (সূরা বাকারা: ১৪৩)

আর এই মধ্যমপন্থা হলো সর্বক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা। বিশ্বাস ও দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যপন্থা। শরিয়ত পালন ও ইবাদতে মধ্যপন্থা। চরিত্র ও মুআমালাতে মধ্যপন্থা। প্রশাসন ও বিচারে মধ্যপন্থা। চিন্তা ও উপলব্ধিতে মধ্যপন্থা। আধ্যাত্মিকতা ও জাগতিকতার মাঝে মধ্যমপন্থা। উদাহরণ ও বাস্তবতায় মধ্যপন্থা। ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক ক্ষেত্রে মধ্যমপন্থা।[২]

এই উম্মাহ তারাই, যারা আঁকাবাঁকা, কণ্টকাকীর্ণ ও বিদঘুটে পথের মাঝে 'সরল-সঠিক' পথের উদাহরণ সৃষ্টি করতে সক্ষম। বাস্তব সাক্ষ্য পেশ করতে সক্ষম আসমান-জমিনের মালিকের পথের, আল্লাহর নিয়ামতপ্রাপ্ত নবি-রাসূল, সিদ্দিকিন, শুহাদা ও সালিহিনের পথের; অভিশপ্ত ও বিভ্রান্তদের পথের নয়।

তিন. দাওয়াহ

মুসলিম উম্মাহ তৃতীয় যে বৈশিষ্ট্যটি ধারণ করে, তা হলো- দাওয়াহ। এই উম্মাহ হকের দাওয়াত ও আল্লাহর কালামের ধারক। এ উম্মাহ আত্মকেন্দ্রিক নয়; বরং প্রচারক ও সর্বজনীন। মুসলিম উম্মাহ হক, কল্যাণ ও হিদায়াত নিজেদের মধ্যে কুক্ষিগত করে রাখতে চায় না; বরং তারা হক, খাইর ও হিদায়াত মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে চায়। আল্লাহর ওপর ঈমানের পাশাপাশি তাদের ওপর ফরজ করা হয়েছে- মানবতার কাছে হকের দাওয়াত পৌঁছে দেওয়া, সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধকে। অন্য

---

১. দেখুন, আমার রচিত আল খাসায়িসুল আম্মাহ লিল ইসলাম (ইসলামের সাধারণ বৈশিষ্ট্যসমূহ) বইয়ের 'আর রব্বানিয়্যাহ' বৈশিষ্ট্য বিষয়ক আলোচনা; মাকতাবাতু ওয়াহবা ও মুয়াসসাতুর রিসালাহ থেকে প্রকাশিত।

২. প্রাগুক্ত, 'আল ওয়াসাতিয়্যাহ' বৈশিষ্ট্য বিষয়ক আলোচনা।

অনেক জাতির ওপর শুধু ঈমান আনা ফরজ ছিল। এই উম্মাহর ওপর অতিরিক্ত কিছু ফরজ হওয়ার কারণ হলো, অন্য জাতিগুলোর ওপর তাদের বিশেষ মর্যাদা।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَ تَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِوَتُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ...

"তোমরাই শ্রেষ্ঠ উম্মত, মানুষের কল্যাণের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজে আদেশ করবে, অসৎকাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান রাখবে।" (সূরা আলে ইমরান: ১১০)

এই উম্মাহ বৈষয়িক বা সাম্প্রদায়িক বিবেচনায় আল্লাহর মানদণ্ডে শ্রেষ্ঠত্ব পায়নি। এটা সম্ভবও না। কারণ, আরব-অনারব নির্বিশেষে যে মানুষই আল্লাহর ওপর ঈমান এনেছে, সে-ই এ উম্মাহর অন্তর্ভুক্ত। মুসলিম উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্ব শুধুই সত্যের মানদণ্ডে। কারণ, তারা সৎকাজের আদেশ দেয়, অসৎকাজে বাধা দেয় এবং আল্লাহর ওপর দৃঢ় ঈমান রাখে।

আল্লাহ তায়ালা আরও অনেক আয়াতে এ কথার পুনরাবৃত্তি করেছেন। যেমন-

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ .

"তোমাদের মধ্য থেকে এমন একদল মানুষ থাকা প্রয়োজন, যারা কল্যাণের দিকে মানুষকে ডাকবে এবং সৎকাজের আদেশ দেবে ও অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। আর তারা (এ দায়িত্ব পালনকারী মানুষেরা) হবে সফলকাম।" (সূরা আলে ইমরান: ১০৪)

এ আয়াতের দুটি ব্যাখ্যা আছে। প্রথম ব্যাখ্যা হলো- দাওয়াতি কাজের দায়িত্ব পালন করার মতো উপযুক্ত করে তোমরা নিজেদের গঠন করবে। জাতির ওপর আদেশ-নিষেধ আরোপের যোগ্যতা অর্জন করবে। এর মাধ্যমে তোমরা নিজেদের সফলকাম করে তুলতে পারবে। তোমাদের এই দায়িত্ব পালন তোমাদেরকে সাফল্যের পথে এগিয়ে দেবে।

দ্বিতীয় ভাষ্যটি হলো- তোমরা নিজেদের মধ্য থেকে এমন একটি দক্ষ ও যোগ্য দল তৈরি করো, যারা সার্বক্ষণিক দাওয়াত, আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার-এর কাজে লিপ্ত থাকবে। যেন এর মাধ্যমে তোমাদের ওপর অর্পিত ফরজে কিফায়ার দায়িত্ব আদায় হয়ে যায়। আর তোমরা সেই দলটিকে সর্বাত্মক সহযোগিতা করো।

ইসলামের বাণী একটি বৈশ্বিক দাওয়াত। এটি প্রত্যেক জাতি, বর্ণ, গোত্র এবং প্রত্যেক ভাষাভাষী তথা সকল পর্যায়ের মানুষের জন্য। যেমন, আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

وَمَا أَرْسَلْنٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ .

"আমি তো আপনাকে বিশ্বজগতের প্রতি কেবল রহমতরূপেই প্রেরণ করেছি।" (সূরা আম্বিয়া: ১০৭)

تَبٰرَكَ الَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلَمِينَ نَذِيرًا.

"পরম কল্যাণময় সত্তা! যিনি তাঁর বান্দার প্রতি ফুরকান অবতীর্ণ করেছেন, যেন তিনি বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারেন।" (সূরা ফুরকান: ১)

قُلْ يَأَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيْعًا ...

"বলুন, হে মানুষসকল! আমি তোমাদের সকলের জন্য আল্লাহর রাসূল।" (সূরা আরাফ: ১৫৮)

প্রত্যেক জাতিকে ইসলামের দিকে ডাকা মুসলিম উম্মাহর ওপর ফরজ, যেন সমগ্র মানবতার সামনে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণিত হয়ে যায়। আরেকটি ফরজ হলো- সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজে বাধাদান। আর দায়িত্ব পালনে বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে এই উম্মাহও যেন পূর্বের জাতিগুলোর মতো অভিশপ্ত হয়ে না পড়ে- সে বিষয়ে সতর্ক করা হয়েছে। আল্লাহ তায়ালা বলেন,

لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنِي إِسْرَاءِيلَ عَلَى لِسَانِ دَاوُدَ وَ عِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَ كَانُوا يَعْتَدُوْنَ ﴿٧٨﴾ كَانُوا لَا يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَاكَانُوا يَفْعَلُوْنَ .

"বনি ইসরাইলের মধ্যে যারা কুফরি করেছিল, তারা দাউদ ও মারইয়ামের ছেলে ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল- এটা এই জন্য যে, তারা ছিল অবাধ্য ও সীমালঙ্ঘনকারী। তারা যেসব গর্হিত কাজ করত, তা থেকে তারা একে অপরকে নিষেধ করত না। তারা যা করত, তা কতই না নিকৃষ্ট।" (সূরা মায়িদা: ৭৮-৭৯)

চার. একতা

মসলিম উম্মাহর চতুর্থ বৈশিষ্ট হলো- একতা। ইসলাম একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি চায়, যদিও তা বিভিন্ন গোত্র, বর্ণ ও জাতের সমন্বয়ে গঠিত। ইসলাম তাদের একই পাত্রে গলিয়ে একীভূত করে ফেলেছে। বিভক্তি ও বিচ্ছিন্নতা দ্রবীভূত করে নিঃশেষ করে দিয়েছে। ইসলাম তাদের যুক্ত করে দিয়েছে অভিচ্ছেদ্য একটি গণজমায়েতে।

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তায়ালা বলেন,

إِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاعْبُدُونِ .

"তোমাদের এই উম্মাহ তো একক জাতি এবং আমিই তোমাদের রব। অতএব, আমারই ইবাদত করো।" (সূরা আম্বিয়া: ৯২)

وَإِنْ هُذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُوْنِ .

"তোমাদের এই উম্মাহ তো একক জাতি এবং আমিই তোমাদের প্রতিপালক। অতএব, আমাকে ভয় করো।" (সূরা মুমিনুন: ৫২)

আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের আকিদা ও শরিয়ত এক করে দিয়েছেন। মুসলিমদের লক্ষ্য অভিন্ন করে দিয়েছেন এবং তাদের জীবন চলার পথ এক করেছেন। অতএব, মুসলিমরা ঐক্যবদ্ধ না হয়ে কীভাবে থাকতে পারে? আল্লাহ রাব্বুল আলামিন বলেন,

وَ أَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ

"এটাই আমার সরল পথ। তোমরা এ পথেরই অনুসরণ করবে; ভিন্ন ভিন্ন পথের অনুসারী হবে না। ভিন্ন পথের পথিক হলে, তা তোমাদের আল্লাহর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।" (সূরা আনআম: ১৫৩)

মুসলিম উম্মাহ হলো এমন জাতি- যাদের রব এক, আর তিনি হলেন আল্লাহ। তাদের নবি এক, তিনি হলেন মুহাম্মাদ সা.। তাদের ওপর নাযিলকৃত আসমানি কিতাব এক- আল কুরআন। তাদের কিবলা এক- পবিত্র কাবা বায়তুল হারাম। তাদের শরিয়তও এক, তা হলো ইসলাম। তাদের জন্মভূমিও একই- বৃহত্তর দারুল ইসলাম। তাদের নেতাও এক- খলিফা বা আমিরুল মুমিনিন যিনি উম্মাহর রাজনৈতিক ঐক্যের বিন্যাস সাধন করেন। ইসলামে একই সময়ে দুজন খলিফা অবৈধ। কারণ, উম্মাহর বক্তব্য ও কর্মসূচি এক এবং অভিন্ন হওয়া জরুরি।

'মুসলিম জাতিসমূহ' না বলে 'মুসলিম উম্মাহ বা জাতি' বলাই সঠিক। আল্লাহর আদেশ অনুযায়ী মুসলিমরা এক উম্মাহ, এক জাতি: বহু জাতি নয়। বহুজাতিত্বের ধারণা আমাদের ওপর আধিপত্যবাদীরাই চাপিয়ে দিয়েছে।

আল্লাহ তায়ালার আমাদের প্রতি নির্দেশ দিয়েছেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوْا ...

"তোমরা সকলে মিলে আল্লাহর রশিকে (দ্বীন) আঁকড়ে ধরো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না।" (সূরা আলে ইমরান: ১০৩)

وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ تَفَرَّقُوْا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ .

"তোমরা তাদের মতো হয়ো না, যাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরও বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে এবং মতবিরোধে লিপ্ত হয়েছে। তাদের জন্য রয়েছে মহা শাস্তি।" (সূরা আলে ইমরান: ১০৫)

কুরআনে আহলে কিতাবদের একাংশের ব্যাপারে সাবধান করে দেওয়া হয়েছে। তারা মুসলিম উম্মাহর ঐক্য ছিন্নভিন্ন করার জন্য অপচেষ্টা চালাবে। গোত্রীয় বিভেদের আগুন উসকে দেবে। আল্লাহ তায়ালা মুসলিমদের সতর্ক করে বলেন,

يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تُطِيعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ يَرُدُّوكُمْ بَعْدَ إِيْمَانِكُمْ كَفِرِينَ .

"হে মুমিনগণ! তোমরা যদি কিতাবধারীদের কোনো দলের অনুসরণ করো, তাহলে ঈমান আনার পর তারা তোমাদের কাফির বানিয়ে ছাড়বে।" (সূরা আলে ইমরান: ১০০)

আয়াতের শানে নুযুল এবং পরবর্তী অংশের দিকে তাকালে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, আয়াতের মর্মবাণী হলো- ঐক্য প্রতিষ্ঠার পর তারা তোমাদের বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে চাইবে, ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর তোমাদের পরস্পরকে শত্রু বানিয়ে ফেলার অপচেষ্টা চালাবে।

উম্মাহর ঐক্যের দাবি হলো, সকল প্রকার গোত্রীয় স্বার্থের ঊর্ধ্বে ইসলামি ভ্রাতৃত্বকে

স্থান দিতে হবে। আল্লাহ তায়ালা এই ভ্রাতৃত্বকে ঈমানের সিঁড়ি ও কাঠামো গণ্য করেছেন। তিনি বলেন,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ ...

"মুমিনরা তো পরস্পর ভাই-ভাই।" (সূরা হুজুরাত: ১০)

রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ لَا يَظْلِمَهُ وَلَا يُسْلِمُهُ.

"মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার ওপর জুলুমও করবে না, তাকে অত্যাচারীর কাছে ছেড়েও দেবে না।"[৩]

অর্থাৎ, কোনো মুমিনের জন্য শোভনীয় নয় যে, সে অন্য মুমিনকে কষ্ট ও বিপদের মাঝে রেখে সরে পড়বে; বরং সেই মুমিনকে সাহায্য ও সমর্থন করাই তার কর্তব্য। এটাই ভ্রাতৃত্বের দাবি। অন্য হাদিসে এই ভ্রাতৃত্বের তাগিদ দিয়ে বলা হয়েছে,

الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ يَسْعَى بِذِمَّتِهِمْ أَدْنَاهُمْ وَيُجِيرُ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يَد عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ.

"মুসলিমদের রক্ত সমান (শাস্তির ক্ষেত্রে ধনী-দরিদ্র, উঁচু-নীচু, গোত্র-বর্ণের কোনো পার্থক্য নেই), একজন সাধারণ মুসলিমও কোনো ব্যক্তিকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি দিতে পারে। তার প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করা সকলের কর্তব্যে পরিণত হবে। আর দূরবর্তী স্থানের মুসলিমরাও তাদের পক্ষে আশ্রয় দিতে পারে।"[৪]

ইসলাম সর্বোচ্চ সতর্ক করে বলেছে- উম্মাহর কোনো সন্তানের সাথে শত্রুতা এমন পর্যায়ে যেতে পারবে না, যে পর্যায়ে গেলে জাহিলি যুগের গোত্রগুলোর মতো পারস্পরিক সংঘাতের সূচনা হয়।

রাসূলুল্লাহ সা. ইরশাদ করেন,

لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ.

"তোমরা আমার পরে কাফির হয়ে যেয়ো না যে, তোমাদের একজন অপরজনের ঘাড়ে আঘাত করবে।"[৫]

سِبَابُ الْمُسْلِمِ فُسُوقٌ وَقِتَالُهُ كُفْرٌ.

"মুসলিমকে গালি দেওয়া ফাসিকি আর হত্যা করা কুফরি।"[৬] ■

- লেখাটি- তারিক মাহমুদ অনুদিত, প্রচ্ছদ প্রকাশন প্রকাশিত ড. ইউসুফ আল কারযাভীর 'ইসলামের ব্যাপকতা' বই থেকে সংগৃহীত।

---

৩. আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা. থেকে বর্ণিত; মুত্তাফাকুন আলাইহি (বুখারি: ২৪৪২, মুসলমি: ৬৭৪৩) এবং সহিহ জামিউস সগির।

৪. আমর ইবনে শুয়াইব রা.-এর সূত্রে বর্ণিত, আবু দাউদ, কিতাবুল জিহাদ: ২৭৫১; ইবনে মাজাহ: ২৮৫২

৫. মুত্তাফাকুন আলাইহি, আল লুলু ওয়াল মারজান: ৪৪। জারির ইবনে আবদুল্লাহ ও আবদুল্লাহ ইবনে উমর রা.-এর সূত্রে হাদিসটি বর্ণিত হয়েছে।

৬. আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ রা.-এর সূত্রে বর্ণিত। মুত্তাফাকুন আলাইহি; আল লুলু ওয়াল মারজান: ৪৩

ইসলাম গণতন্ত্র ও নির্বাচন

ড. মো: ছামিউল হক ফারুকী

মানুষের শান্তির জন্য সমাজে ইনসাফ প্রতিষ্ঠা জরুরী। সমাজে অশান্তির মূল কারণ অন্যায়, জুলুম ও দুর্নীতি। পক্ষান্তরে ন্যায়, ইনসাফ ও সুনীতি সমাজে শান্তির আবহ তৈরী করে এবং মানব জীবনকে করে তুলে সুখী ও আনন্দপূর্ণ। এজন্য কোনো সমাজকে শান্তিপূর্ণ সমাজে রূপান্তরিত করতে হলে, সমাজের প্রতিটি মানুষের মধ্যে ন্যায়বোধ জাগ্রত করতে হবে। আর সমাজ পরিচলানার দায়িত্ব যাদের উপর অর্পিত হবে তাদেরকে হতে হবে ন্যায়বান ও ইনসাফের মূর্ত প্রতীক। অন্যায় প্রবণ জনসাধারণ এবং জালিম শাসকদের দ্বারা কখনোই সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়। এজন্যই ইসলাম ন্যায়ভিত্তিক শাসন ব্যবস্থা, ন্যায়পরায়ণ শাসক এবং নীতি নৈতিকতাসম্পন্ন জনশক্তি গড়ে তোলাকে সবচেয়ে বেশী গুরুত্ব দিয়েছে। আল কুরআনে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেছেন,

الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ.

"তারা এমন লোক যাদেরকে আমি পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করলে সালাত কায়েম করে, যাকাত আদায় করে, কল্যাণ ও ন্যায়ের আদেশ দেয় এবং অন্যায়কে প্রতিহত করে"।[১]

এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, শুধু ন্যায় কাজ করা এবং ন্যায়ের আদেশ দেওয়া যথেষ্ট নয়। সাথে সাথে অন্যায়-জুলুমকেও প্রতিহত করতে হবে। অন্যথায় অন্যায়-জুলুমের দানব শান্তিকে বিনষ্ট করে দেবে এবং অশান্তিকে প্রজ্জলিত করবে, যার লেলিহান শিখা থেকে ন্যায়বানরাও রেহাই পাবে না।

ন্যায় ও ইনসাফ ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠাই ইসলামের লক্ষ

সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠাই ইসলামী শরী'আহর মুল লক্ষ। আর শান্তিপূর্ণ সমাজের জন্য ইনসাফ প্রতিষ্ঠা জরুরী। অন্যায় ও জুলুম সামাজকে অশান্ত করে তুলে। অপর দিকে ন্যায় ও ইনসাফ সমাজকে করে তুলে শান্তিপূর্ণ, সুখী ও সমৃদ্ধিশালী। এজন্যই ইসলাম অন্যায়-জুলুম নির্মূল করে ন্যায় ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করার পদক্ষেপ নেয়। আল্লাহ তা'আলা আল কুরআনে বলেন,

لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ.

"নিশ্চয়ই আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনাদিসহ প্রেরণ করেছি এবং তাদের

১. ২২-সূরা আল হাজ্জ : ৪১

সাথে নাযিল করেছি কিতাব ও ন্যায়দন্ড, যাতে লোকেরা ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আমি আরও নাযিল করেছি লৌহ, যাতে প্রচন্ড রণশক্তি ও লোকদের জন্য বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে"।[২]

এ আয়াতে রাসূলগণকে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য বলা হয়েছে। এ ইনসাফ কায়েমের জন্য কিতাব ও ন্যায়দন্ড অবতীর্ণ করা হয়েছে বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আয়াতে লৌহ প্রদানের উল্লেখ করে বলা হয়েছে, এতে প্রচন্ড রণশক্তি রয়েছে। মুফাসসিরগণ এর অর্থ করেছেন, যারা ইনসাফ প্রতিষ্ঠায় প্রতিবন্ধকতা তৈরী করবে, তাদেরকে বুঝিয়ে ইনসাফের পথে আনতে হবে। শত বুঝানোর পরেও যদি ইনসাফ কায়েমে প্রতিবন্ধকতা থেকে নিবৃত না হয়, তাহলে সে জালেমদেরকে শক্তি প্রয়োগে প্রতিহত করতে হবে, যাতে ইনসাফ প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে সকল বাঁধা বিদূরিত হয়।

অন্য এক স্থানে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُوا.

"হে ঈমানদারগণ, তোমরা ইনসাফের প্রতিষ্ঠাকারী হয়ে যাও এবং আল্লাহর জন্য সাক্ষী হয়ে যাও। যদিও তা তোমাদের নিজেদের, পিতামাতা বা নিকটাত্মীয়ের বিরুদ্ধে যাক। কেউ ধনী বা গরীব যাই হোক, আল্লাহই তাদের প্রতি অধিক কল্যাণকামী। সুতরাং তোমরা প্রবৃত্তির অনুসরণ করতে গিয়ে ন্যায়-ইনসাফ থেকে বিরত থেকো না।[৩]

এ আয়াতে এবং সূরা আল হাদীদের উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা লোকদেরকে ইনসাফ কায়েমের নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, শুধু নিজে ইনসাফ করা এবং ইনসাফের পথে চলাই যথেষ্ট নয়, বরং সমাজের সর্বস্তরে ইনসাফ কায়েম করা জরুরী। এজন্য সকলকে ইনসাফের ঝান্ডা নিয়ে দৃপ্তপদে এগিয়ে যেতে হবে এবং অন্যায় ও জুলুম নির্মূল করে ন্যায়, ইনসাফ ও সুবিচার প্রতিষ্ঠার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ও সাধ্যমত চেষ্টা-প্রচেষ্টায় রত থাকতে হবে।

সমাজের ন্যায় বিচার ও ইনসাফ কায়েম করা শুধু বিচার বিভাগ ও সরকারের দায়িত্ব নয়। জনগণকেও এ দায়িত্ব পালনে তৎপর হতে হবে। অবশ্য দুষ্ট ও ক্ষমতাধর জালিমদেরকে শাসনের শৃংখলে বেঁধে অন্যায় পরিত্যাগ করে ন্যায়ের পথে আসতে বাধ্য করা সরকারেরই দায়িত্ব।

মহান আল্লাহ তার রাসূলকে সর্বদা ইনসাফ ও ন্যায় বিচার করার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন,

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ .

"তুমি বলে দাও, আমার রব সুবিচারের নির্দেশ দিয়েছেন"।[৪]

---

২. ৫৭-সূরা আল হাদীদ : ২৫
৩. ৪-সূরা আন-নিসা : ১৩৫
৪. ৭-সূরা আল আ'রাফ : ২৯

وَإِنْ حَكَمْتَ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ .

"আর যখন তুমি ফায়সালা করবে, তাদের মধ্যে ফায়সালা করবে ইনসাফের ভিত্তিতে। নিশ্চয়ই আল্লাহ ইনসাফকারীদের পছন্দ করেন"।[৫]

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ .

সুতরাং তুমি আহ্বান জানাতে থাক এবং তোমাকে যেভাবে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তার উপর অটল থাক। আর তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না এবং বল "আল্লাহ যে কিতাব নাযিল করেছেন, আমি তার প্রতি ঈমান এনেছি। আর আমি আদিষ্ট হয়েছি তোমাদের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার"।[৬]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূলকে দ্বীনের প্রতি মানুষকে আহ্বান করতে এবং তার উপর অবিচল থাকতে ও প্রবৃত্তির অনুসরণ না করে লোকদের মধ্যে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার নির্দেশ দিয়েছেন। এর দ্বারা বুঝা যায় যে, ন্যায়ানুগ সমাজ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা রাসূলের অন্যতম দায়িত্ব।

এটা যে, শুধু রাসূলের দায়িত্ব এবং রাসূলকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা নয়, বরং সর্বসাধারণেরও দায়িত্ব। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ .

"নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ, আত্মীয়দের হক আদায়ের নির্দেশ দিচ্ছেন এবং অশ্লীলতা, অন্যায় ও সীমালংঘন করা থেকে নিষেধ করছেন। তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন, যাতে তোমরা তা গ্রহণ করতে পার।"[৭]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা 'আদল' এবং ইহসান শব্দ উল্লেখ করেছেন। 'আদল' হলো, যে যেমন হক বা মর্যদার উপযোগী, তাকে তেমন হক বা মর্যাদা প্রদান করা। আর 'ইহসান' হলো কাউকে পাওনার চেয়ে অধিক হক বা মর্যাদা প্রদান করা অথবা প্রাপ্য না হওয়া সত্বেও সদাশয় হয়ে তাকে প্রদান করা। ইসলাম শুধু ন্যায়পরায়ণতার নির্দেশই দেয়নি। বরং এর পরিসর আরো সম্প্রসারণ করে ইহসানের নির্দেশ দিয়েছে। অন্যত্র আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন,

وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُواْ بِالْعَدْلِ.

"যখন তোমরা লোকদের মাঝে বিচার-ফায়সালা করবে, তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার-ফায়সালা করবে।[৮]

উল্লেখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ (সা) ও মুমিনদেরকে ন্যায় বিচার ও

---

৫. ৫-সূরা আল মায়িদা : ৪২
৬. ৪২-সূরা আশ্-শুরা : ১৫
৭. ১৬-সূরা আন্ নাহল : ৯০
৮. ৪, সূরা আন নিসা : ৫৮

ইনাসাফভিত্তিক ফায়সালার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং ন্যায়বিচার ও ইনসাফ প্রতিষ্ঠা প্রতিটি মুমিনের জন্য অত্যাবশ্যক এবং এটি মুত্তাকীদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

اعْدِلُواْ هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى.

"তোমরা ন্যায় বিচার করো, এটিই তাকওয়ার অধিকতর নিকটবর্তী।"[৯]

কোনো অজুহাতেই ন্যায়-ইনসাফ থেকে বিরত থাকা যাবে না

ন্যায় ইনসাফ ইসলামের অবিচ্ছেদ্য অংশ। কোনো অজুহাতেই এর ব্যত্যয় ঘটানো যাবে না। নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণে অথবা বৈরী শক্তির প্রতি শত্রুতার কারণে কারো প্রতি ইনসাফের খেলাফ আচরণ করা যাবে না। এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

فَلاَ تَتَّبِعُواْ الْهَوَى أَن تَعْدِلُواْ

"প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তোমরা ন্যায় আচরণ থেকে বিরত থেকো না।"[১০]

وَلاَ يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلاَّ تَعْدِلُواْ

"কোনো সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ন্যায় থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ না করে।"[১১]

উপরোল্লিখিত আয়াতসমূহে আল্লাহ তা'আলা ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য সাধারণ নির্দেশ দানের পাশাপাশি যে সকল কারণে মানুষ ইনসাফ বিরোধী কাজ করে অথবা ন্যায়-ইনসাফকে এড়িয়ে যায়, সেগুলো উল্লেখ করে সর্বাবস্থায় ইনসাফের উপর অটল থাকার জন্য বিশেষ তাকাদা দিয়েছেন।

যে সকল কারণে মানুষ ইনসাফ বিরোধী কাজ করে অথবা ইনসাফকে এড়িয়ে চলে–

১. নিজের স্বার্থ সুবিধা, পিতা-মাতা, আত্মীয়-স্বজন, বন্ধু-বান্ধব, প্রিয়জন প্রভৃতির প্রতি প্রীতি বা তাদের প্রতি দুর্বলতার কারণে। সূরা নিসার ১৩৫ নং আয়াতে এ বিষয়গুলোর উল্লেখ করা হয়েছে।

২. প্রবৃত্তির দাবী পূরণ করতে গিয়ে মানুষ অনেক সময় ইনসাফকে বর্জন করে। সূরা নিসার ১৩৫ নং আয়াতে এটি বর্ণিত হয়েছে।

৩. কেউ মতের বাইরে গেলে অথবা ফায়সালা মানতে অস্বীকার করে বিদ্রোহ করলে এবং পরবর্তীতে তাদেরকে আয়ত্বে বা বশে আনতে সক্ষম হলে। সূরা আল হুজুরাতের ৯নং আয়াতে এর উল্লেখ রয়েছে।

৪. খোদাভীতি বা তাকওয়া না থাকার কারণে মানুষ ন্যায় পরিহার করে অন্যায়ে লিপ্ত হয়। সূরা আল মায়িদার ৮ নং আয়াতে এর বর্ণনা রয়েছে।

৫. কারো প্রতি বা কোনো সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ ও শত্রুতার কারণে তাদের প্রতি ইনসাফ না করে জুলুম করে থাকে। সূরা মায়িদার ৮ নং আয়াতে এটি উল্লেখ করা হয়েছে।

---

৯. ৫, সূরা আল মায়িদা : ৮
১০. ৪, সূরা আন নিসা : ১৩৫।
১১. ৫, সূরা আল মায়িদা : ৮

মানুষ তার স্বভাবজাত দুর্বলতার জন্য উপরোল্লিখতি কারণে ন্যায় বিচার ও ইনসাফ কায়েম করতে পিছপা হয়। আল্লাহ তা'আলা সে বিষয়গুলো বিশেষভাবে উল্লেখ করে ঐ সকল ক্ষেত্রে ন্যায় ও ইনসাফের অনুশীলনের জন্য জোর তাকিদ দিয়েছেন।

সুতরাং অনুরাগ বা বিরাগ, লোভ বা ভীতি, অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থা, শত্রুতা বা মিত্রতা, প্রবৃত্তির কুপ্ররোচণা প্রভৃতি কোনো কিছুর বশবর্তি হয়ে ন্যায় ও ইনসাফের খেলাফ কোনো কিছু করতে ইসলাম কঠোরভাবে নিষেধ করেছে। পক্ষান্তরে সর্বাবস্থায় ন্যায় ও ইনসাফের উপর অটল অবিচল থাকতে বিশেষভাবে নির্দেশ দিয়েছে। তাছাড়া আল্লাহ তা'আলা ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করারও নির্দেশ দিয়েছেন। নিম্নে আমরা এ বিষয়ে আলোচনা করবো

ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বনর করা

যেখানে একাধিক ব্যক্তি বা পক্ষ রয়েছে, সেখানে কাউকে বা কোন পক্ষকে সমর্থন বা কারো পক্ষ অবলম্বন করতে হলে অবশ্যই ন্যায়ের সমর্থন বা ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বন করতে হবে। সেক্ষেত্রে ন্যায়ের পক্ষ পরিহার করে বিপরীত পক্ষ অবলম্বন করা বৈধ নয়।

ন্যায়ের পক্ষ অবলম্বনের অনেকগুলো দিক রয়েছে। নিম্নে তা আলোচনা করা হলো :

১. ভাল ও কল্যাণকর কাজে সহযোগিতা করা

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

"আর তোমরা ভাল ও তাকওয়ামূলক কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করো এবং পাপাচার ও সীমালংঘনমূলক কাজে একে অপরকে সাহায্য করো না।[১২]

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজে বসবাস করতে হলে তার জন্য অন্যের সাহায্য ও সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক। এ পারস্পরিক সাহায্য-সহযোগিতা যদি ভাল ও কল্যাণকর কাজে হয়, তাহলে সমাজ শান্তিতে ভরে উঠবে, যার সুফল প্রতিটি মানুষই ভোগ করতে পারবে। পক্ষান্তরে পারস্পরিক সহযোগিতা যদি অন্যায় ও ক্ষতির কাজে হয়, যেমন অপরাধ, চুরি, ডাকাতি, হত্যা, লুণ্ঠন ও কাউকে ক্ষতি করার জন্য এবং অপরাধী, দুনীতিবাজ, চোর, ডাকাত ও সন্ত্রাসীদের বড় বড় দল গঠিত হয়, তাহলে তাদের পারস্পরিক সাহায্য সহযোগিতা মানুষের শান্তি ও সামাজিক ব্যবস্থা তছনছ করে দেবে। এজন্যই এ আয়াতে কল্যাণ ও ন্যায়ের পক্ষে অবস্থান নিয়ে তাকে শক্তিশালী ও সুদৃঢ় করার জন্য সহযোগিতা করতে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়ে তার সহযোগিতা না করতে আল্লাহ তা'আলা নির্দেশ দিয়েছেন। এজন্য কুরআনের বহু আয়াত এবং বহুসংখ্যা হাদীছে কল্যাণ ও ভাল কাজের আদেশ এবং অকল্যাণ ও অন্যায় কাজের নিষেধ করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এমনকি ন্যায়ের পোষকতাকে এতটাই গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে যে, এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, إِنَّ الدَّالَّ عَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ

১২. ৫, সূরা আল মায়িদা : ২

'অবশ্যই ভাল কাজের পথ প্রদর্শক ভাল কাজকারীর মত।'[১৩] অন্য হাদীছে আছে,

مَنْ دَلَّ عَلَى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ أَجْرِ فَاعِلِهِ

যে ব্যক্তি ভাল কাজের পথ প্রদর্শন করে, তার জন্য ভাল কাজকারীর সমপরিমাণ ছওয়াব রয়েছে।'[১৪] আরেকটি হাদীছে রয়েছে,

مَنْ دَعَا إِلَى هُدًى، كَانَ لَهُ مِنَ الْأَجْرِ مِثْلُ أُجُورِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ أُجُورِهِمْ شَيْئًا، وَمَنْ دَعَا إِلَى ضَلَالَةٍ، كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْإِثْمِ مِثْلُ آثَامِ مَنْ تَبِعَهُ، لَا يَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ آثَامِهِمْ شَيْئًا

'যে ব্যক্তি সৎ পথের দিকে আহ্বান জানায় সে ব্যক্তি তাদের সমপরিমাণ ছওয়াব পাবে, যারা তা অনুসরণ করেছে অথচ তাদের ছওয়াব থেকে কোন কিছু কমানো হবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথের দিকে আহ্বান জানায় সে ব্যক্তি তাদের সমপরিমাণ গুনাহের অধিকারী হবে, যারা তা অনুসরণ করেছে, অথচ তাদের গুনাহ থেকে কোন কিছু কমানো হবে না।'[১৫] অন্যদিকে আল্লাহর রাসূল (সা) বলেছেন,

مَنْ مَشَى مَعَ ظَالِمٍ لِيُعِينَهُ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهُ ظَالِمٌ، فَقَدْ خَرَجَ مِنَ الْإِسْلَامِ

'যে ব্যক্তি জালেম জানা সত্ত্বেও কোন জালেমকে সাহায্য করার জন্য তার সাথে চলে, সে ইসলাম থেকে বের হয়ে যায়।'[১৬]

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «انْصُرْ أَخَاكَ ظَالِمًا أَوْ مَظْلُومًا» فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَنْصُرُهُ إِذَا كَانَ مَظْلُومًا، أَفَرَأَيْتَ إِذَا كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ أَنْصُرُهُ؟ قَالَ: «تَحْجُزُهُ، أَوْ تَمْنَعُهُ، مِنَ الظُّلْمِ فَإِنَّ ذَلِكَ نَصْرُهُ.

আনাস (রা) হতে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (সা) বলেছেন, তোমার ভাইকে সাহায্য করো, জালেম হোক অথবা মাজলুম। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহর রাসূল! মাজলুম অবস্থায় তো তাকে সাহায্য করব, কিন্তু জালেম অবস্থায় তাকে কিভাবে সাহায্য করব? এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কি? তিনি বললেন, তাকে জুলুম থেকে বারণ করো, এটাই তার জন্য তোমার সাহায্য।[১৭] আল কুরআনের বাণী :

قَالَ رَبِّ بِمَا أَنْعَمْتَ عَلَيَّ فَلَنْ أَكُونَ ظَهِيرًا لِلْمُجْرِمِينَ.

'মুসা (আ) বললেন, হে আমার রব আপনি আমার প্রতি যে অনুগ্রহ করেছেন এরপর আমি কখনো পাপীদের সাহায্যকারী হবো না।'[১৮]

এর ব্যাখ্যায় তাফসীরে রুহুল মা'আনীতে একটি হাদীছ উদ্ধৃত করা হয়েছে যে,

---

১৩. তিরমিযী, কিতাবুল ইলম, হাদীস নং ২৬৭০, আনাস ইবনে মালেক (রা) থেকে বর্ণিত। মুসনাদে আহমাদ হাদীস নং ২৩০২৭।

১৪. মুসলিম, কিতাবুল ইমারাহ, হাদীস নং ১৮৯৩, আবু দাউদ, কিতাবুল আদাব, হাদীস নং ৫১২৯, তিরমিযি, কিতাবুল ইলম, হদীস নং ২৬৭১।

১৫. মুসলিম, কিতাবুল ইলম, বাবুমান সান্না সুন্নাতান হাসানাতান আও সায়্যিয়াহ, হাদীস নং ২৬৭৪, আবু দাউদ, কিতাবুস সুন্নাহ, বাবু লুযুমিস সুন্নাহ, হাদীস নং ৪৬০৯, তিরমিযি, কিতাবুল ইলম, বাবু মাজাআ ফিমান দাআ ইলাল হুদা, হাদীস নং ২৬৭৪।

১৬. তাবারানী, মু'জামুল কাবীর, হাদীস নং ৬১৯, হাদিসটি জ'ঈফ।

১৭. বুখারী, কিতাবুল হিয়াল, হাদীস নং ৬৯৫২।

১৮. ২৮, সূরা আল কাসাস : ১৭

রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন, কিয়ামাতের দিন ডাক দেওয়া হবে, অত্যাচারী ও তাদের সাহায্যকারীরা কোথায় আছ? অত:পর যারা অত্যাচারীদের দোয়াত কলমও ঠিক করে দিয়েছে তাদেরকেও একটি লৌহ শবাধারে একত্রিত করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।"

অন্য একটি আয়াতে আল্লাহ তা'আলা বলেছেন,

وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَنْ يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ.

(হে রাসূল) আপনি আশা করতেন না যে, আপনার প্রতি কিতাব নাযিল হবে। এটা কেবল আপনার রবের পক্ষ হতে রহমত। সুতরাং আপনি কাফিরদের সাহায্যকারী হবেন না।"[১৯]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা রাসূল (সা) কে কাফিরদের সাহায্যকারী হতে নিষেধ করেছেন। কেননা কাফিররা মুসলিমদের শত্রু এবং জালিম। সর্ব যুগেই তারা মুসলিমদের প্রতি জুলুম ও ক্ষতি করার জন্য সর্বদা সচেষ্ট থেকেছে। বর্তমানে ফিলিস্তিন, কাশ্মীর, মায়ানমার, আফগানিস্তান, ইরাক যার জ্বলন্ত নমুনা। বিশ্বের বিভিন্ন কাফির রাষ্ট্রগুলো নানাভাবে মুসলিমদের উপর নির্বিচারে নিধনযজ্ঞ চালাচ্ছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কোনা কোন মুসলিম রাষ্ট্র তাদেরকে সমর্থন ও সহযোগিতা করছে। আল কুরআনের উল্লেখিত আয়াতে তা সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। যারা কাফিরদেরকে সহযোগিতা করে, বিশেষ করে অন্যায় ও মুসলিম সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধন এবং খুন খারাবীর কাজে, তাদেরকে আখিরাতে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হতে হবে।

২. যোগ্য ও উত্তম লোকদেরকে নিযুক্ত বা নির্বাচিত করা

ন্যায় ইনসাফের দাবি হলো, যে কোন পদে নিযুক্তি বা নির্বাচিত করার ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ নিরপেক্ষভাবে যোগ্য, উত্তম ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে। অন্যথায় তা আমানতের খেয়ানত হিসেবে গণ্য হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ .

'নিশ্চয় আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দেন যে, তোমরা যেন আমানতসমূহ প্রাপকের কাছে পৌঁছে দাও। আর যখন লোকদের মাঝে ফায়সালা করবে, তখন যেন ন্যায়ের ভিত্তিতে ফায়সালা কর।'[২০]

এ আয়াতে আল্লাহ তা'আলা আমানতের হিফাজত ও তা হকদারের নিকট যথাযথভাবে পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাকিদ দিয়েছেন। এ নির্দেশের মধ্যে সকল মানুষ এবং সর্বপ্রকার আমানতই শামিল রয়েছে। আলী, যায়েদ ইবন আসলাম এবং শাহর ইবন হাওশাব (রা) এর মতে এখানে সম্বোধন করা হয়েছে মুসলিমদের নেতৃবৃন্দকে। প্রথম মতটিই অধিক যুক্তিযুক্ত।[২১]

---

১৯. ২৮, সূরা আল কাসাস : ৮৬
২০. ৪, সূরা আন নিসা : ৫৮
২১. মোহাম্মদ ইবন আলী আশ্ শাওকানী : তাফসীর কাতাহুল কাদী, খ. ১, পৃ. ৬৪১

আয়াতে الْأَمَانَاتِ শব্দটি বহুবচন ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা আমানতের বহুমাত্রিকতা বুঝানো হয়েছে। সুতরাং আমানত বলতে শুধু কারো নিকট অপর কারো কোন বস্তু বা সম্পদ গচ্ছিত রাখাকেই বুঝায় না। বরং সকল প্রকার দায়িত্ব, কর্তব্য ও পদমর্যাদাকেও বুঝায়। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইবন কাছীর বলেন, 'এর দ্বারা মানুষের উপর আবশ্যকীয় সকল প্রকার আমানতকেই সাধারণভাবে বুঝানো হয়েছে। চাই তা বান্দার উপর আল্লাহর হক হোক যেমন-সালাত, যাকাত, কাফফারা, নযর, সাউম ইত্যাদি। অথবা তা বান্দাদের পরস্পরের হক হোক, যেমন গচ্ছিত বস্তুসমূহ বা অন্যান্য যা মানুষ কোন সাক্ষীকে অবহিত করা ছাড়াই পরস্পরের নিকট আমানত রাখে। আল্লাহ তা'আলা সকল প্রকার আমানতকে আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। যদি কেউ দুনিয়াতে তা আদায় না করে তাহলে কিয়ামাতের দিন তার নিকট হতে তা আদায় করা হবে।"[২২]

রাষ্ট্রীয় পদ পদবীও আল্লাহর আমানত : আল্লামা মুফতি মুহাম্মদ শফি তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন, "এতে প্রতিয়মান হয় যে, রাষ্ট্রীয় যত পদ ও পদমর্যাদা রয়েছে, সে সবই আল্লাহ তা'আলার আমানত। যাদের হাতে এসকলের নিয়োগ-বরখাস্তের অধিকার রয়েছে তারা হলেন এর আমানতদার। সুতরাং তাদের জন্য কোন পদ এমন কাউকে অর্পণ করা জায়েয নয়, যে তার যোগ্য নয়। বরং প্রতিটি পদের জন্য নিজের ক্ষমতা ও সাধ্যানুযায়ী যোগ্য ব্যক্তির অনুসন্ধান করা প্রয়োজন।"

তিনি আরো বলেন, 'কোন পদে অযোগ্য ব্যক্তির নিয়োগকর্তা অভিশাপযোগ্য। যোগ্যতা ও পরিপূর্ণ শর্ত মোতাবেক কোন লোক পাওয়া না গেলে উপস্থিত লোকদের মধ্যে যোগ্যতা ও আমানতদারী তথা সততার দিক দিয়ে যে সবচেয়ে অগ্রবর্তি হবে তাকেই অগ্রাধিকার দিতে হবে।"[২৩] এ প্রসঙ্গে এক হাদীছে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন,

مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ الْمُسْلِمِينَ شَيْئًا فَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مُحَابَاةً فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهِ، لا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلا عَدْلًا حَتَّى يُدْخِلَهُ جَهَنَّمَ.

'যাকে মুসলিমদের কোন দায়িত্ব অর্পণ করা হয়, তারপর যদি কাউকে (তার যোগ্যতা যাচাই ছাড়া) একান্ত বন্ধুত্ব কিংবা সম্পর্কের কারণে তাদের উপর নিয়োগ প্রদান করে তবে তার উপর আল্লাহর লা'নত হবে। না তার ফরজ (ইবাদাত) কবুল হবে, না নফল। এমনকি সে জাহান্নামে প্রবিষ্ট হবে।[২৪] এ হাদীছে **صَرْفًا وَلا عَدْلًا** বাক্য ব্যবহার করা হয়েছে, কেউ কেউ **صَرْفًا** এর অর্থ করেছেন তাওবা এবং **عَدْلًا** এর অর্থ করেছেন ফিদিয়া বা বিনিময়। আবার কেউ কেউ **صَرْفًا** শব্দের অর্থ করেছেন নফল 'ইবাদাত এবং **عَدْلًا** শব্দের অর্থ করেছেন ফরজ 'ইবাদাত।

---

২২. ইবন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, খ. ২, পৃ. ৩৭৭
২৩. তাফসীরে মাআ'রিফুল কুরআন, সূরা নিসা-৫৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা দ্র.
২৪. মুসনাদে আহমাদ, হাদীস নং ২১

আমানতের সুরক্ষা ব্যতীত ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠা সম্ভব নয়

আলোচিত আয়াতে প্রথমে আমানতকে যথাস্থানে যথাযথভাবে পৌঁছাতে বলা হয়েছে, তারপর লোকদের মাঝে ন্যায়ের ভিত্তিতে হুকুম দানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কারণ সমাজের কর্তৃত্ব, নিয়ন্ত্রণ ও শাসন পরিচালনার দায়িত্ব যাদের হাতে তারাই মূলতঃ ন্যায় বা অন্যায় করতে বেশি সক্ষম। কেননা এ সংক্রান্ত কর্তৃত্ব তাদের হাতে ন্যস্ত থাকে। ন্যায়পরায়ণ লোকেরা সমাজের কর্তৃত্ব ও পরিচালনার দায়িত্বে নিয়োজিত থাকলে তারা সমাজে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠা করবে। পক্ষান্তরে জালেম, ফাসেক, ফাজের ও দুর্নীতিবাজ লোকদের হাতে সমাজের কর্তৃত্ব ও পরিচালনার দায়িত্ব থাকলে তারা সমাজকে অন্যায়, জুলুম ও দুর্নীতিতে ভরে ফেলবে। এজন্যই আয়াতে প্রথমে আমানত বা দায়িত্বকে উপযুক্ত, দক্ষ ও সততা সম্পন্ন লোকদের হাতে ন্যস্ত করতে বলা হয়েছে। অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ও প্রশাসনিক কাজসহ সকল ক্ষেত্রে ন্যায়পরায়ণ ও যোগ্যতর লোকদেরকে নিয়োগদান করতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যাতে তাদের মাধ্যমে ন্যায় ইনসাফ প্রতিষ্ঠিত হতে পারে।

সুতরাং সমাজ বা রাষ্ট্রে ন্যায়-ইনসাফ প্রতিষ্ঠার জন্য যাদের হাতে দেশের শাসন ক্ষমতা, তাদেরকে ন্যায়পরায়ণ হতে হবে এবং সরকারী বা প্রশাসনিক পদে ন্যায়পরায়ণ, যোগ্য ও দক্ষ লোক নিয়োগ দিতে হবে।

কোন পদে যেন স্বজনপ্রীতি, আত্মীয়তার সম্পর্ক, কারো সুপারিশ অথবা ঘুষ উৎকোচের বিনিময়ে অযোগ্য, অথর্ব, আত্মসাৎকারী, দুর্নীতিপরায়ণ ও অত্যাচারী লোক নিয়োজিত বা নির্বাচিত হতে না পারে, সে ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে। কারণ অন্যায় আত্মসাতকারী ও অত্যাচারী লোক নিয়োগ পেলে বা নির্বাচিত হলে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠার আর কোন উপায় থাকেনা।

এ আয়াতে মহান আল্লাহ সরকারী পদসমূকেও আমানত বলে সাব্যস্ত করে একথা স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, আমানত যেমন শুধুমাত্র তাদেরকে প্রত্যার্পণ করতে হয়, যারা তার প্রকৃত মালিক। কোন ফকির, মিসকিনকে দয়াপরবশ হয়ে কারো আমানত দিয়ে দেওয়া কিংবা কোন আত্মীয় স্বজন অথবা বন্ধু বান্ধবকে অন্য কারো আমানত দিয়ে দেওয়া জায়েয নেই। অনুরূপভাবে যোগ্য, দক্ষ ও ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিরাই সরকারী পদ পদবীর হকদার, তাদের ছাড়া অন্যকে তা প্রদান করলে আমানতের চরম খেয়ানত হবে।[২৫] (চলবে)

---

২৫. মুফতি মুহাম্মদ শফী, মা'আরেফুল কুরআন, সংক্ষিপ্ত বাংলা তাফসীর, পৃ.২৫৯

ইসলামের আলোকে সন্ত্রাস নির্মূলে রাষ্ট্রের করণীয়

ড. মুহাম্মদ শাহিদুল ইসলাম

সন্ত্রাস একটি বৈশ্বিক সমস্যা, যা মানবতা, শান্তি ও নিরাপত্তার জন্য চরম হুমকি। ইসলাম ধর্ম শান্তি, ন্যায়বিচার ও মানবকল্যাণের ওপর প্রতিষ্ঠিত, এবং সন্ত্রাস-সহিংসতা ইসলামি মূল্যবোধের পরিপন্থী। কুরআন ও হাদীস সন্ত্রাস ও ফিতনা থেকে মানুষকে রক্ষা করতে রাষ্ট্র ও সমাজকে সক্রিয় ভূমিকা পালনের নির্দেশ দেয়। এই আলোচনায়, সন্ত্রাস নির্মূলে রাষ্ট্রের করণীয়সমূহ কুরআন-হাদীস ও ইসলামী মনীষীদের দৃষ্টিতে বিশ্লেষণ করা হলো।

সন্ত্রাস ও ইসলাম পরিপন্থী দুই ধারণা

ইসলামের মৌলিক বার্তা হল শান্তি, মানবতা ও কল্যাণ। অথচ আজকের বিশ্বে ইসলামকে অনেক সময়ই সন্ত্রাসের সাথে জড়ানো হয়। কিছু বিভ্রান্ত গোষ্ঠী ইসলামের নামে সন্ত্রাসমূলক কর্মকান্ড করে গোটা দ্বীনকে কলুষিত করছে। প্রকৃতপক্ষে, ইসলাম সন্ত্রাসকে সম্পূর্ণরূপে হারাম এবং মানবতাবিরোধী বলে চিহ্নিত করেছে। মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾

"আর তোমরা সেই প্রাণকে হত্যা করো না, যাকে আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন, ন্যায়সঙ্গত কারণ ছাড়া।"[১]

এই আয়াতের তাফসীরে ইমাম ইবনু কাসীর রহ. বলেন: "এই আয়াতটি মানবজীবনের পবিত্রতা ও নিরাপত্তাকে সুরক্ষা দেওয়ার প্রধান দলিল। এটি কেবল মুসলিম নয়, অমুসলিম বা ধিম্মীর জীবনও অন্তর্ভুক্ত করে।"[২]

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :

﴿مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي ٱلْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ ٱلنَّاسَ جَمِيعًا﴾

"যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে একটি প্রাণকে হত্যা করে, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল।"[৩]

এই আয়াতের তাফসীরে তাফসীরে জালালাইনে উল্লেখ করা হয়েছে : "আল্লাহ মানুষের প্রাণকে যে সম্মান দিয়েছেন তা রক্ষা করা প্রতিটি ব্যক্তির দায়িত্ব। এক ব্যক্তির হত্যাও সমগ্র মানবতার হত্যার সমতুল্য।"[৪]

---

১. সূরা আল-ইসরা, ৩৩
২. ইবন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, খ. ৩, পৃ. ৬৩২।
৩. সূরা মায়িদা, ৩২।
৪. তাফসীরে জালালাইন, পৃ. ১৪২।

এছাড়া হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে,

الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ

"প্রকৃত মুসলিম সে-ই, যার মুখ ও হাত থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ।"[৫]

অন্য এক হাদীসের বর্ণনায় এসেছে,

مَن حَمَلَ علَينا السِّلاحَ فلَيسَ منَّا

"যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র তোলে, সে আমাদের দলভুক্ত নয়।"[৬]

এই হাদীসের ব্যাখ্যায় ইবনে হাজার আসকালানী রহ. ব্যাখ্যায় বলেন, "এই হাদীসটি রাজনৈতিক বিদ্রোহ, শাসকের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ, ও ইসলামী সমাজে ভয় সৃষ্টির নিষেধাজ্ঞার প্রমাণ।" ইবন হাজার, ফাতহুল বারী, হাদীস নং-৭০৭০

এপ্রসঙ্গে ইমাম গাযযালী রহ. বলেন, "যেখানে রাষ্ট্র নেই, সেখানে নিরাপত্তা নেই; আর যেখানে নিরাপত্তা নেই, সেখানে দ্বীন টিকে না। এজন্যই সন্ত্রাস ইসলামের বড় শত্রু।"

এ প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন,

فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ السُّلْطَانِ نُصْرَةُ الْمَظْلُومِ وَقَمْعُ الظَّالِمِ

"রাষ্ট্রপ্রধানের কাজ হলো নির্যাতিতকে সাহায্য করা ও অত্যাচারীকে দমন করা।"

আমরা যদি খিলাফতে রাশিদার শাসনব্যবস্থার দিকে দৃষ্টিপাত করি তাহলে দেখতে পাবো যে, উমর রা. আন্তরিকভাবে নিরীহ নাগরিকদের রক্ষা ও রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে বিশেষ বাহিনী গঠন করেন 'আসহাবে সুরতা'। যারা রাতে পাহারা দিতেন।

খলিফা আল মাহদি ও হারুনুর রশীদ রাষ্ট্রীয়ভাবে দস্যুতা, ভ্রান্ত ফিরকা ও বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে কঠোর আইন চালু করেন। যেমন 'হিরাবা' শাস্তি।

সন্ত্রাস ও ইসলাম পরস্পরবিরোধী। ইসলাম একটি নিরাপত্তাপূর্ণ সমাজ ও মানবতানির্ভর রাষ্ট্র চায়, যেখানে হুরমত (সম্মান), নিফস (জীবন), মাল (সম্পদ) ও দীনের নিরাপত্তা থাকবে। রাষ্ট্র যদি কুরআন-হাদীস ও মনীষীদের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসারে সন্ত্রাস প্রতিরোধে কার্যকর ব্যবস্থা নেয়, তবে শুধু নিজ দেশে নয়, বিশ্বজুড়েই শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

সন্ত্রাস প্রতিরোধে রাষ্ট্রীয় ভিত্তি ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা

ন্যায়বিচার একটি রাষ্ট্রের মূল স্তম্ভ। ইসলামের দৃষ্টিতে ন্যায়বিচার শুধু প্রশাসনিক বা বিচারালয়ের দায়িত্ব নয়, বরং এটি একটি দ্বীনি ফরজ। যখন রাষ্ট্র সমাজে বৈষম্য, দুর্নীতি ও জুলুমকে প্রশ্রয় দেয়, তখন জনগণের মধ্যে ক্ষোভ জন্ম নেয়, যা ধীরে ধীরে উগ্রতা ও সন্ত্রাসে রূপ নিতে পারে। এ সম্পর্কে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন :

﴿إِنَّ ٱللَّهَ يَأۡمُرُ بِٱلۡعَدۡلِ وَٱلۡإِحۡسَٰنِ﴾

"নিশ্চয়ই আল্লাহ আদেশ করেন ন্যায়বিচার ও উপকারের।"[৭]

---

৫. বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-১০।
৬. বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৭০৭০
৭. সূরা আন-নাহল, ৯০।

এই আয়াতের তাফসীরে আল্লামা ইবনে কাছীর রহ. বলেন, "এই আয়াতে আল্লাহ তা'আলা তিনটি জিনিসের আদেশ দিয়েছেন: (১) ন্যায়বিচার, (২) ইহসান বা উত্তম ব্যবহার, (৩) আত্মীয়তার হক আদায়।"[৮]

এখান থেকে বুঝা যায়, ন্যায়বিচার শুধুমাত্র শাসন নয় বরং ইবাদত।

মহান আল্লাহ আরো বলেন,

﴿وَإِذَا حَكَمْتُم بَيْنَ ٱلنَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِٱلْعَدْلِ﴾

"আর যখন তোমরা মানুষের মাঝে বিচার কর, তখন ন্যায়বিচার কর।"[৯]

এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন, "আয়াতটি সরাসরি রাষ্ট্র ও বিচারকদের উদ্দেশ্যে। এখানে বলা হয়েছে বিচার যেন কখনো পক্ষপাতদুষ্ট না হয়। এটি আল্লাহর পক্ষ থেকে একটি 'আমানত'।"[১০]

এ প্রসঙ্গে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

إِنَّمَا هَلَكَ مِنْ كان قَبْلِكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الْحَدَّ

"তোমাদের পূর্ববর্তী জাতিগণ ধ্বংস হয়েছে এজন্য যে, যখন তাদের সম্মানিত ব্যক্তি চুরি করত, তারা তাকে ছেড়ে দিত, আর যখন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করত, তখন তার ওপর শাস্তি প্রয়োগ করত।"[১১]

এই হাদীসে রাসূল সা. জানিয়ে দিচ্ছেন যে, দ্বিমুখী বিচারনীতি সমাজকে ধ্বংস করে। পক্ষপাতদুষ্ট বিচার সন্ত্রাস জন্ম দেয়।

হাদীসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

الْقُضَاةُ ثَلَاثَةٌ: اثْنَانِ فِي النَّارِ، وَوَاحِدٌ فِي الْجَنَّةِ

"বিচারক তিন প্রকার: দু'জন জাহান্নামে, একজন জান্নাতে।"[১২]

এ থেকে বুঝা যায় যে, সঠিকভাবে ন্যায়বিচার না করলে বিচারকের ওপরও জবাবদিহিতা রয়েছে।

এ প্রসঙ্গে ইমাম ইবন তাইমিয়া রহ. বলেন,

الملك يبقى مع الكفر ولا يبقى مع الظلم

"রাষ্ট্র কুফরীর ওপর টিকে থাকতে পারে, কিন্তু জুলুমের ওপর নয়।"

এ প্রসঙ্গে ইমাম মালিক রহ. বলেন, **العدل أساس الملك** "ন্যায়বিচার হল শাসনের ভিত্তি।"

এসকল মনীষীগণ স্পষ্টভাবে বলেছেন যে, যেখানে জুলুম চলবে, সেখানে রাষ্ট্র ধ্বংস

---

৮. ইবন কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আজীম, খ. ৪, পৃ. ৭০৪।
৯. সূরা আন-নিসা, ৫৮।
১০. কুরতুবী, জামিউ লি আহকামিল কুরআন, খ. ৫, পৃ. ২৫৫।
১১. বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং- ৬৭৮৮।
১২. আবু দাউদ, আস-সুনান, হাদীস নং- ৩৫৭৩।

হবে। এমনকি যদি সেখানে নামাজ, রোযা থেকেও থাকে, কিন্তু ইনসাফ না থাকে তা আল্লাহর আরশকে কাঁপিয়ে তোলে।

এছাড়া ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে, উমার রা. ইসলামের ইতিহাসে তিনিই প্রথম রাষ্ট্রীয়ভাবে 'মুহাসিব' বা ন্যায্যতার পর্যবেক্ষক নিয়োগ করেন। তাঁর সময়ে যদি একজন গভর্নর দুর্নীতি করত, তাঁকে বিচারের মুখোমুখি করা হতো। এক্ষেত্রে উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, খালিদ ইবনে ওয়ালিদ রা.-কে একজন সাধারণ সাহাবীর অভিযোগের ভিত্তিতে সাময়িকভাবে অপসারণ করেছিলেন।

এছাড়া সুলতান মাহমুদ গজনবী তাঁর দরবারে মুসলিম-অমুসলিম সকল প্রজার জন্য এক ও অভিন্ন বিচারপ্রক্রিয়া ছিল। ঐতিহাসিক 'বাইহাকী' তাঁর সুবিচারের উদাহরণ টানেন।

তাই এক্ষেত্রে রাষ্ট্রের করণীয় হলো : বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা রক্ষায় আমির, প্রধানমন্ত্রী, প্রেসিডেন্ট কেউই আইনের ঊর্ধ্বে নয়; দুর্নীতিমুক্ত ও দায়িত্বশীল পুলিশ-প্রশাসন গঠন ইসলামি আইন ও মানবিক আইন সমন্বয়ে একটি ভারসাম্যপূর্ণ বিচারনীতি প্রতিষ্ঠা; গরিব-ধনী, নারী-পুরুষ, মুসলিম-অমুসলিম সকলের জন্য সমান বিচারপ্রাপ্তি নিশ্চিত করা।

বর্তমানে অনেক রাষ্ট্রে বিচার ব্যবস্থা প্রভাবশালী রাজনীতিবিদ ও ব্যবসায়ীদের হাতে জিম্মি। এ থেকেই জন্ম নেয় বিচারহীনতা, ক্ষোভ, বিদ্রোহ এবং পরিণতিতে সন্ত্রাস। রাষ্ট্র যদি এই ন্যায়বিচারহীনতা দূর না করে, তাহলে সমাজে 'আত্মরক্ষার নামে প্রতিশোধবাদিতা' বাড়বে, যার পরিণতি ভয়াবহ। এ ক্ষেত্রে আমরা আরব বসন্তের কথা উল্লেখ করতে পারি। কারণ আরব বসন্তে বহু দেশে সন্ত্রাসের বিস্তার ঘটে রাজনৈতিক বিচারহীনতা ও বৈষম্যের ফলস্বরূপ।

সন্ত্রাস নির্মূলে একটি অপরিহার্য মাধ্যম ধর্মীয় শিক্ষার শুদ্ধ প্রচার

সন্ত্রাসবাদ প্রায়শই ধর্মের ভুল ব্যাখ্যা ও অপব্যবহার থেকে উদ্ভূত হয়। অজ্ঞতা, বিভ্রান্তি ও সঠিক দিকনির্দেশনার অভাবে তরুণ সমাজ উগ্রপন্থার শিকার হয়। ইসলামে ধর্মীয় শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম; এটি শুধু বিশ্বাসের বিকাশ নয়, বরং সমাজে সঠিক মূল্যবোধ ও নৈতিকতার চর্চার মাধ্যম। সুতরাং, রাষ্ট্রের জন্য অপরিহার্য দায়িত্ব হলো ধর্মীয় জ্ঞান শুদ্ধ ও সঠিকভাবে প্রচার করা, যাতে সন্ত্রাসের বীজ জন্মার আগেই তা নির্মূল করা যায়। মহান আল্লাহর বাণী,

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَآئِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا۟ فِى ٱلدِّينِ﴾

"তাদের প্রত্যেক গোষ্ঠীর মধ্যে একটি দল যেন বেরিয়ে যায় যারা ধর্মে গভীর জ্ঞান অর্জন করে।"[১৩]

ইমাম কুরতুবী ও ইবনে আব্বাস রহ. ব্যাখ্যা করেছেন, ইসলামী সমাজে আলেমের সংখ্যা ও তাদের শিক্ষার গুরুত্ব অপরিসীম। কারণ আলেমরাই ধর্মের আসল ধারাকে বাঁচিয়ে রাখেন এবং ভুল ব্যাখ্যা থেকে রক্ষা করেন।

---

১৩. সূরা তওবা, ১২২।

এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের উপর ফরজ।"[১৪]

এই হাদীস শিক্ষার গুরুত্ব বোঝায়, যা শুধুমাত্র ব্যক্তিগত নয়, বরং সামাজিক কল্যাণের জন্যও অপরিহার্য। শিক্ষিত ব্যক্তিরাই সমাজে সঠিক দিকনির্দেশনা দিতে পারেন।

এ সম্পর্কে ইমাম গাযযালী রহ. বলেন, "অজ্ঞতার কারণে মানুষ সহজেই বিভ্রান্ত হয়; তাই আলেমদের উচিত জনগণকে যথাযথ শিক্ষার মাধ্যমে সঠিক পথে পরিচালিত করা।"

এ প্রসঙ্গে ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, "ধর্মীয় জ্ঞান ছাড়া মানুষ সহজেই ভুল পথে পড়ে যায়, আর ভুল ধারনা থেকে সন্ত্রাস ও উগ্রতা জন্মায়।"

এ ক্ষেত্রে রাষ্টের করণীয় হলো :

ক. শুদ্ধ ও পরিমিত শিক্ষাব্যবস্থা: শিক্ষকদের সিলেকশন ও প্রশিক্ষণে বিশেষ যত্ন নেওয়া। যারা ইসলামের প্রকৃত বার্তা বহন করতে পারে।

খ. সরকারি ও বেসরকারি দাওয়াতি কার্যক্রম সমর্থন: তরুণদের জন্য হাদীস ও কুরআনের আধুনিক ব্যাখ্যা ও শিক্ষা পৌঁছে দেওয়া।

গ. মিডিয়া ও প্রযুক্তির ব্যবহার: ভুল তথ্য প্রতিরোধে সোশ্যাল মিডিয়া, টেলিভিশন ও অনলাইন প্ল্যাটফর্মে সঠিক ইসলামি শিক্ষা প্রচার।

আজকের যুগে যেসব সংগঠন বা গোষ্ঠী সন্ত্রাস চালায়, তারা মূলত ধর্মীয় শিক্ষার অভাবে বা বিকৃত জ্ঞানের কারণে মানুষের বিভ্রান্তি সৃষ্টি করে। রাষ্ট্র যদি সঠিক শিক্ষাকে সর্বস্তরে পৌঁছে দিতে না পারে, তবে সন্ত্রাস নির্মূল কঠিন। সুতরাং শিক্ষার মাধ্যমে সন্ত্রাসের 'বীজ' কেটে ফেলা প্রয়োজন।

তাই শুদ্ধ ও পরিপূর্ণ ধর্মীয় শিক্ষা ছাড়া সমাজে শান্তি ও নিরাপত্তা টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। কুরআন-হাদীসের আলোকে দেখা যায়, শিক্ষা একমাত্র পথ যা উগ্রতাকে রোধ করে, সন্ত্রাস নির্মূল করে এবং একটি শান্তিপূর্ণ সমাজের ভিত্তি স্থাপন করে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো এই শিক্ষাকে সবার জন্য সহজলভ্য করে তোলা এবং ভুল ধারণা থেকে জনসাধারণকে রক্ষা করা।

সন্ত্রাস নির্মূলে রাষ্ট্রের মৌলিক দায়িত্ব অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাস

অর্থনৈতিক বৈষম্য ও সামাজিক দুর্ভোগ সন্ত্রাসের অন্যতম প্রধান উৎস। যখন গরীব, অসহায় ও বঞ্চিতরা জীবিকার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়, তখন তারা হতাশায়, ক্ষোভে ও অবিচারে সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীর প্রলোভনে পড়ে। ইসলামে অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার ও সামাজিক সাম্যের তাগিদ রয়েছে, যা সন্ত্রাস নির্মূলের জন্য অপরিহার্য ভিত্তি। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো এই বৈষম্য দূর করে সবার জন্য সমান সুযোগ ও সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এই জন্য মহান আল্লাহ ধনীদের উপর যাকাতকে ফরজ করেছেন। মহান আল্লাহর বাণী : ﴿وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ "যাকাত দাও।"[১৫]

---

১৪. ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং-২২৪।

১৫. সূরা বাকারা, ৪৩।

আল্লাহ পবিত্র সম্পদের ভাগ করে দিতে আদেশ করেছেন, যা অর্থনৈতিক সাম্যের ভিত্তি গঠন করে।

এ আয়াতের তাফসীরে ইমাম কুরতুবী রহ. বলেন,

﴿يُؤْتِي ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقَّ وَيَجْعَلُ لِلْعَادِلِ ٱلْعَدْلَ﴾

"রাজা সঠিক ন্যায় প্রদান করে এবং ন্যায়পরায়ণের জন্য ন্যায় প্রতিষ্ঠা করে।"[১৬]

এ আয়াতের ব্যাপারে ইবনে কাছীর রহ. বলেন, যাকাত হচ্ছে আল্লাহর আদেশিত আর্থিক সমতা বিধানের অন্যতম প্রধান মাধ্যম। এটি দারিদ্র্য বিমোচনে কার্যকর। রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতিতেও ন্যায়পরায়ণতা জরুরি।

এ সম্পর্কে হাদীসের এক বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

مَا نَقَصَتْ صَدَقَةٌ مِنْ مَالٍ

"যাকাত কোনোভাবেই সম্পদ হ্রাস করে না।"[১৭]

অর্থাৎ অর্থনৈতিক দান ও সমবন্টন একটি সামাজিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির মাধ্যম।

হাদীসের অপর এক বর্ণনায় এসেছে,

لُمسلِمُ أخو المُسلمِ، لا يَظلِمُه ولا يَخذُلُه ولا يَحقِرُه

"মুসলিম মুসলিমের ভাই; সে তাকে অবিচার করে না, পরিত্যাগ করে না, অবহেলা করে না।"[১৮]

অর্থনৈতিক বৈষম্য ও অবহেলা সমাজে বিভাজন সৃষ্টি করে।

এ সম্পর্কে ইমাম গাযযালী রহ. বলেন, "অর্থনৈতিক অন্যায় ও বৈষম্য সমাজে বিদ্বেষ ও অশান্তির বীজ বপন করে, যা সন্ত্রাসের জন্ম দেয়।"

ইমাম ইবনে তাইমিয়া রহ. বলেন, "রাষ্ট্র যদি দরিদ্র ও গরীবদের অধিকার রক্ষা না করে, তবে সেটি সামাজিক অবিচার ও বিপ্লবের উৎসস্থল।"

এ ক্ষেত্রে রাষ্টের করণীয় হলো : কার্যকর সামাজিক নিরাপত্তা নীতি গ্রহণ করা; দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য যথাযথ কর্মসংস্থান সৃষ্টি করা; যাকাত, ওয়াকফ ও অন্যান্য সম্পদ সুষ্ঠুভাবে ব্যবহার ও তদারকি করা; কর ব্যবস্থা ন্যায়সঙ্গত করা, যাতে ধনী-গরিবের মধ্যে বৈষম্য কমে সে ব্যবস্থা করা এবং দুর্নীতি প্রতিরোধ ও অর্থনৈতিক নীতি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক করা ইত্যাদি।

বর্তমানে অর্থনৈতিক বৈষম্য পৃথিবীর অধিকাংশ রাষ্ট্রেই বড় সমস্যা। বিভিন্ন অঞ্চলে অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা, বেকারত্ব ও সামাজিক অবিচার সন্ত্রাস ও উগ্রবাদ বাড়িয়েছে। বাংলাদেশসহ মুসলিম দেশগুলোতেও এই চ্যালেঞ্জ আছে। ফলে দারিদ্র্য বিমোচন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই সন্ত্রাসবিরোধী রাষ্ট্রীয় নীতির অপরিহার্য অংশ।

অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের মাধ্যমে রাষ্ট্র সন্ত্রাসের বীজ কেটে ফেলতে পারে। কুরআন-

---

১৬. কুরতুবী, জামিউ লি আহকামিল কুরআন, খ. ১, পৃ. ৩৪৩।
১৭. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-২৫৭৭।
১৮. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-২৫৬৪

হাদীস ও মনীষীদের নির্দেশনা অনুযায়ী, ন্যায়বিচার ও দারিদ্র্য বিমোচন ছাড়া শান্তিপূর্ণ সমাজ প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। রাষ্ট্র ও সমাজকে একসাথে কাজ করে দরিদ্র ও অসহায়দের জন্য নিরাপদ সুযোগ সৃষ্টিতে মনোযোগ দিতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন,

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

"অতএব, তোমার মুখ পুরোদমে দীন (ইসলামের) প্রতি ফেরাও, যেন আল্লাহর প্রকৃত সৃষ্টি ও প্রকৃতি অনুযায়ী।"[১৯]

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে শক্তিশালী ও কার্যকর আইন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা একটি রাষ্ট্রের মৌলিক কর্তব্য। সন্ত্রাস সমাজে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টি করে, নাগরিকদের নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি করে এবং রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার দুর্বলতা প্রকাশ করে। ইসলামে ফিতনা (বিভ্রান্তি ও বিশৃঙ্খলা) রোধ করা খুবই জরুরি এবং এটি আল্লাহ ও রাসূলের শাসন ব্যবস্থার একটি মূল অংশ। সুতরাং, রাষ্ট্রের উচিত কঠোর, ন্যায়সঙ্গত ও আধুনিক আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদের প্রতিরোধ করা।

﴿إِنَّمَا جَزَاءُ ٱلَّذِينَ يُحَارِبُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ وَيَسْعَوْنَ فِي ٱلْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوٓاْ أَوْ يُصَلَّبُوٓاْ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَٰفٍ أَوْ يُنفَوْاْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي ٱلدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾

"যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সঙ্গে যুদ্ধ করে এবং পৃথিবীতে দাঙ্গা সৃষ্টি করে, তাদের জন্য শাস্তি হলো হত্যা, ক্রসের ওপর ঝুলানো, হাত ও পা পরস্পরের বিপরীত দিকে কাটা অথবা নির্বাসন; এরা এইসব শাস্তি ভোগ করবে এবং আখিরাতেও তাদের জন্য রয়েছে মহাবিপদজনক শাস্তি।"[২০]

ইমাম কুরতুবী ও ইবনে কাসীর বলেন, এই আয়াত দ্বারা রাষ্ট্রকে স্পষ্ট নির্দেশ দেয়া হয়েছে ফিতনা-সন্ত্রাসকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর শাস্তি প্রয়োগের ব্যাপারে। এই শাস্তিগুলো সন্ত্রাসের দমনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে এবং জনগণের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে।

এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্র যে সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে পারে তাহলো : কার্যকর আইন প্রণয়ন ও সংশোধন করা; স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বিচারব্যবস্থা গঠন করা; আধুনিক গোয়েন্দা ও নিরাপত্তা বাহিনী প্রতিষ্ঠা ও প্রশিক্ষণ দেওয়া; সন্ত্রাসবাদের অর্থায়ন ও সহায়তা চক্র ধ্বংস করা; সন্ত্রাসবাদের প্রচারণা ও উগ্রবাদী তত্ত্ব মোকাবেলায় তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার করা এবং জনগণকে আইনের প্রতি আস্থা বৃদ্ধির জন্য সচেতনতা ও অংশগ্রহণ উৎসাহিত করা ইত্যাদি।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে কঠোর, ন্যায়সঙ্গত ও আধুনিক আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ রাষ্ট্রের একান্ত কর্তব্য। কুরআন-হাদীসের নির্দেশনা ও মনীষীদের শিক্ষায় স্পষ্ট যে, নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠায়

---

১৯. সূরা রুম, ৩০।
২০. সূরা মায়িদা, ৩৩।

আইন প্রয়োগ অপরিহার্য। রাষ্ট্র যদি সন্ত্রাস দমনে আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগে সৎ ও নিরপেক্ষ হয়, তবে সমাজে স্থায়ী শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে ইনশাআল্লাহ।

সন্ত্রাস নির্মূলে একটি মূল হাতিয়ার শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুনর্গঠন

সমাজের মানসিক ও নৈতিক গঠন গড়ে ওঠে শিক্ষা ও সংস্কৃতির মাধ্যমে। সন্ত্রাস ও উগ্রতা মূলত তখনই বিকাশ পায় যখন শিক্ষা ব্যবস্থা দুর্বল ও বিকৃত হয়, আর সংস্কৃতি বিভ্রান্তিমূলক ধারণায় আচ্ছন্ন হয়। ইসলামে শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে; কারণ এগুলো মানুষের চরিত্র ও সমাজের মূল্যবোধ স্থির করে। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো একটি সঠিক, মানবিক ও ভারসাম্যপূর্ণ শিক্ষা ও সংস্কৃতি প্রতিষ্ঠা করা, যা সন্ত্রাসের মূল শিকড় চিরতরে ধ্বংস করতে সক্ষম। মহান আল্লাহর বাণী : ﴿وَقُل رَّبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ "হে আমার রব, আমাকে আরও জ্ঞান বৃদ্ধি দাও।"[২১]

এই আয়াতের তাফসীরে ইবনে কাছীর বলেন, আল্লাহতায়ালা মানুষকে শুধু জ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করেছেন; এই জ্ঞান ধর্মীয় ও বিশ্বের ব্যাপারে হতে পারে। সঠিক জ্ঞানই মানুষকে গাইড করে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে।

অন্য এক আয়াতে মহান আল্লাহ ঘোষণা করেছেন,

﴿اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ﴾

"পড় তোমার প্রভুর নামে, যিনি সৃষ্টি করেছেন।"[২২]

প্রথম অবতীর্ণ আয়াত হওয়ায় এটি শিক্ষা ও জ্ঞানের গুরুত্বকে স্পষ্ট করে।

এ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ

"জ্ঞান অর্জন প্রত্যেক মুসলিমের ওপর ফরজ।"[২৩]

শিক্ষা অর্জন শুধু ব্যক্তিগত দায়িত্ব নয়, বরং সমাজের জন্যও অপরিহার্য। শিক্ষিত সমাজই ভালো সংস্কৃতির ভিত্তি।

এ প্রসঙ্গে ইমাম গাযযালী রহ. বলেন, "যে শিক্ষিত, তার হৃদয় আলোকিত হয়; আলোকিত হৃদয়ই প্রকৃত শান্তির আধার।"

এ সম্পর্কে শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভী রহ. বলেন, "শিক্ষা ছাড়া ইসলাম সম্পূর্ণ হয় না; শিক্ষা সংস্কৃতি ও চিন্তার মূল চালিকাশক্তি।"

এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের করণীয় হলো : শিক্ষা ব্যবস্থায় মানবিক ও নৈতিক মূল্যবোধের অন্তর্ভুক্তিকরণ; আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষার সাথে সমন্বয় করা; তরুণদের জন্য সংস্কৃতি ও সৃজনশীলতার সুযোগ বৃদ্ধি করা; মিডিয়া ও জনসংযোগে সৎ ও শান্তিপ্রিয় বার্তা প্রচার করা; ভ্রান্ত ধারণা ও উগ্রতা বিরোধী সংস্কৃতির উন্নয়ন করা এবং আলেম ও শিক্ষাবিদদের সমন্বয় ও সহযোগিতা বৃদ্ধিতে উদ্যোগ নেওয়া ইত্যাদি।

---

২১. সূরা ত্বাহা, ১১৪।
২২. সূরা আল-আলাক, ১।
২৩. ইবনে মাজাহ, আস-সুনান, হাদীস নং-২২৪।

বর্তমান সমাজে প্রযুক্তির বিস্তার ও তথ্যপ্রবাহ বেড়ে যাওয়ায়, শিক্ষার সাথে সংস্কৃতির গুরুত্ব অনেক বেড়ে গেছে। তরুণ সমাজ ভুল তথ্য ও উগ্রতাবাদে বিভ্রান্ত হচ্ছে। সুতরাং, রাষ্ট্র যদি একটি সুষম ও আধুনিক শিক্ষা-সংস্কৃতি পরিবেশ সৃষ্টি করতে পারে, তবে উগ্রতা ও সন্ত্রাসের প্রবণতা কমে আসবে।

সামাজিক সম্প্রীতি ও ঐক্যবদ্ধতা

সন্ত্রাসের অন্যতম উত্স হল সামাজিক ভেদাভেদ, বিদ্বেষ ও বিভাজন। ধর্ম, বর্ণ, সম্প্রদায়, জাতি ইত্যাদি ভিন্নতা থাকা স্বত্ত্বেও যদি সমাজে ঐক্য ও সম্প্রীতি থাকে, তাহলে সন্ত্রাস ও দাঙ্গার সুযোগ অনেকটাই কমে যায়। ইসলামে ভিন্ন ভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে শান্তি ও একাত্মতার প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। ধর্ম, বর্ণ ও সম্প্রদায়গত বৈচিত্র্যের মধ্যে সংহতি বজায় রাখা সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন :

﴿يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا﴾

"হে মানব জাতি! নিশ্চয় আমরা তোমাদের এক পুরুষ ও এক স্ত্রী থেকে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদের বিভিন্ন জাতি ও গোত্র করেছি যাতে তোমরা পরস্পর চিনতে পারো।"[২৪]

এই আয়াতে ভিন্নতার মাধ্যমে পারস্পরিক সম্মান ও সম্পর্ক গড়ে তোলার আহ্বান রয়েছে, দ্বন্দ্ব নয়।

সামাজিক দাঙ্গা ও বিদ্বেষ প্রতিরোধ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

لا يزال المؤمن في فُسحةٍ من دينه ما لم يُصِبْ دمًا حرامًا

"এজন মুমিন তার দ্বীনের ব্যাপারে প্রশস্ততায় থাকে যতক্ষণ না সে অবৈধ রক্তপাত করে।"[২৫]

জাতি ও ধর্ম নির্বিশেষে সংহতির ভূমিকা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সা. বলেছেন,

الْمُسْلِمُونَ كا لجَسَدِ الواحد إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الجَسَدِ بِالسَّهَرِ والحُمَّى

"মুসলিমরা যেন এক দেহের মতো, যার এক অঙ্গ ব্যথিত হলে পুরো দেহ জ্বরে ও অস্বস্তিতে কষ্ট পায়।"[২৬]

ঐক্যবদ্ধতা জাতিকে শক্তিশালী করে সন্ত্রাস ও বিভাজন রোধ করে।

সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ছাড়া সন্ত্রাস প্রতিরোধ অসম্ভব। ইসলাম সামাজিক ঐক্য, পারস্পরিক সম্মান ও সংলাপের ওপর জোর দেয়। রাষ্ট্র ও সমাজকে ঐক্যবদ্ধ রেখে সামাজিক দাঙ্গা প্রতিরোধ করতে হবে।

আন্তর্জাতিক সম্পর্ক ও কূটনীতি

সন্ত্রাসবাদের সমস্যা এক দেশ বা অঞ্চলের সীমাবদ্ধ নয়, এটি বৈশ্বিক সমস্যা। এর প্রতিকারেও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও কূটনীতির ভূমিকা অপরিসীম। মুসলিম দেশগুলোর

---

২৪. সূরা হুজুরাত, ১৩।
২৫. বুখারী, আস-সহীহ, হাদীস নং-৬৮৭২।
২৬. মুসলিম, আস-সহীহ, হাদীস নং-২৫৮৬।

মধ্যে ঐক্য, আন্তর্জাতিক সংস্থায় কূটনৈতিক উদ্যোগ, এবং ইসলামোফোবিয়া মোকাবিলা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে গ্লোবাল যুদ্ধের অন্যতম অঙ্গ।

সন্ত্রাসবাদের একটি আন্তর্জাতিক জাল রয়েছে, যা বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করে। রাষ্ট্রগুলোকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মোকাবেলা করতে হয়। আন্তর্জাতিক সহযোগিতা ও প্রতিরোধের প্রতি ইঙ্গিত দিয়ে মহান আল্লাহ বলেন,

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ﴾

"ভালো কাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে সহযোগিতা কর।"[২৭]

এ ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের করণীয় হলো : মুসলিম রাষ্ট্রপ্রধানদের উচিত কূটনৈতিক ও নিরাপত্তা ক্ষেত্রে সহযোগিতা বৃদ্ধি করা। ইসলামের বিরুদ্ধে ভুল ধারণা ও বিদ্বেষ ছড়ানোর মাধ্যমে সন্ত্রাসবাদের প্ররোচনা বাড়ে। রাষ্ট্র ও মুসলিম সমাজকে প্রচার মাধ্যমে এসব ভুল ধারণার বিরুদ্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে মোকাবিলা করতে হবে।

আন্তর্জাতিক একতা ও সহযোগিতা ছাড়া সন্ত্রাসবাদের সুষ্ঠু মোকাবিলা অসম্ভব। মুসলিম বিশ্বের ঐক্য, সচেতনতা, এবং আন্তর্জাতিক নীতির যথাযথ প্রয়োগ প্রয়োজন। সুতরাং সন্ত্রাস নির্মূল একক উদ্যোগে সম্ভব নয়। রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তি পর্যায়ে ন্যায়বিচার, শিক্ষা, অর্থনৈতিক সুযোগ, সামাজিক ঐক্য ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে সমন্বিত নীতি প্রয়োজন। ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা, আইনশৃঙ্খলা রক্ষা, শিক্ষা ও অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা। সামাজিক সম্প্রীতি বজায় রাখা, বিদ্বেষ নিরসন ও সহনশীলতা প্রচার এবং সামাজিক ন্যায় ও শান্তি রক্ষায় নিজ দায়িত্ব পালনে সচেষ্ট থাকা।

পরিশেষে বলা যায় যে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির পুনর্গঠন ছাড়া সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে টেকসই যুদ্ধ সম্ভব নয়। কুরআন-হাদীস ও মনীষীদের আলোকে দেখা যায়, জ্ঞান, সংস্কৃতি ও নৈতিকতা সমৃদ্ধ সমাজই শান্তি প্রতিষ্ঠার মূল। রাষ্ট্রের দায়িত্ব হলো এ সব মূল্যবোধ তরুণ সমাজের মাঝে প্রতিষ্ঠা করে একটি উন্নত, মানবিক ও সহনশীল জাতি গড়ে তোলা।

ইসলাম শান্তি, ন্যায় ও মানবকল্যাণের ধর্ম। সন্ত্রাস ইসলাম ও মানবতার পরিপন্থী। কুরআন ও হাদীস সন্ত্রাস নির্মূলে ইনসাফ, শিক্ষা, অর্থনৈতিক সাম্য, এবং কঠোর আইন প্রয়োগের ওপর গুরুত্ব দেয়। রাষ্ট্র শুধু প্রশাসনিক নয়, বরং নৈতিক ও আধ্যাত্মিক ভিত্তিতেও জনসচেতনতা সৃষ্টি করে সন্ত্রাস নির্মূলে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। ইসলামী মনীষীগণও রাষ্ট্রকে একটি ন্যায়ভিত্তিক, মানবিক ও আলোকিত সমাজ প্রতিষ্ঠার নেতৃত্ব দানের আহ্বান জানিয়েছেন। সন্ত্রাস নির্মূলে এই সমন্বিত দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণই বর্তমান সময়ে সময়োপযোগী ও কার্যকর পদক্ষেপ। ■

লেখক : সহযোগী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, হামদর্দ বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশ, মুন্সিগঞ্জ।

---

২৭. সূরা মায়িদা, ২।

মামদানির বিজয়

মীযানুল করীম

হাউজ অফ রিপ্রেজেন্টেটিভ এর প্রথম মহিলা স্পিকার আলাস্কার ন্যান্সি পেলোসির পদত্যাগের সময় নিউইয়র্কে অন্যরকম বিপ্লব ঘটল। ৪০০ বছরের ইতিহাসে প্রথম মুসলিম মেয়র নির্বাচিত হলেন জোহরান মামদানি। তিনি আমাদের এই দক্ষিণ এশিয় উপমহাদেশের বংশভূত। তিনি তরুণ হিসেবে যুবকদের প্রতিনিধিত্ব করেন। তিনি প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের ঘোর বিরোধী। তা সত্ত্বেও তিনি জিতেছেন। যুক্তরাষ্ট্রের মূল্যস্ফীতি এবং জ্বালানিসহ নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের দাম বৃদ্ধি পেয়েছে বলে পত্রিকায় উঠেছে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প অস্বীকার করেছেন। এখন দেখা যাক, নতুন মেয়র তার প্রতিশ্রুতি কতটা রক্ষা করেন। ট্রাম্প বলেছেন, বিরোধী দল ডেমোক্রেটিক পার্টি যে প্রচার চালিয়েছে তা মিথ্যা। আসলে জিনিসপত্রের দাম কমেছে। ট্রাম্পের যুক্তি, যেসব বাড়তি খরচের কথা বলা হচ্ছে, প্রকৃতপক্ষে সেগুলোর খরচ কম।

নির্বাচনে ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থী মামদানির জয় দেশটির জাতীয় রাজনীতিতে নতুন বার্তা দিচ্ছে। মামদানি ছাড়াও ভার্জিনিয়া ও নিউ জার্সি অঙ্গরাজ্যে ৪ নভেম্বর অনুষ্ঠিত গভর্ণর পদে নির্বাচনে উদারপন্থী ডেমক্রেট প্রার্থী আবিগেইল স্প্যানবার্গার ও মিকি শেরিল রিপাবলিকান প্রার্থীদের হারিয়েছেন।

এমন সময় মামদানিসহ ডেমোক্রেট প্রার্থীদের জয়ে ভবিষ্যৎ 'কিছুটা উজ্জ্বল' দেখছেন যুক্তরাষ্টের সাবেক প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। ৪ নভেম্বরের নির্বাচনে বিজয়ী ডেমোক্রেটিক পার্টির প্রার্থীদের অভিনন্দন জানিয়ে বলেছেন, দলের জন্য এখনো বহু কাজ করতে হবে। এক্সে এক পোস্টে ওবামা লিখেছেন, 'এটা মনে করিয়ে দিচ্ছে যে, যখন আমরা বলিষ্ঠ দূরদৃষ্টি সম্পন্ন নেতাদের একত্র হই যারা পরিবর্তন আনতে পারার মতো বিষয়গুলোকে গুরুত্ব দেন, সে সময় আমরা জয়ী হতে পারি।' মামদানি যেভাবে নির্বাচনী প্রচার চালিয়েছেন, তেমনটি বারাক ওবামার প্রথম প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর থেকে আর দেখা যায়নি বলে উল্লেখ করেছেন ওবামার সাবেক উপজাতীয় নিরাপত্তা পরামর্শক বেন রোডস। গত ৫ নভেম্বরের রেডিও ফোরের টুডে অনুষ্ঠানে তিনি বলেছেন, মামদানি নিউইয়র্ক শহরের তরুণ ভোটার ও অভিবাসীদের ভোট দিতে যাওয়ার আহ্বান জানিয়ে নির্বাচনের চিত্র বদলে দিয়েছেন।

ভোটের রেকর্ড

গত ৪ নভেম্বর নিউইয়র্ক শহরের মেয়র নির্বাচনে প্রায় ২০ লাখ ভোটার ভোট দিয়েছেন, যা ৫৬ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। এর মধ্যে স্থানীয় সময় ৫ নভেম্বর সকাল সাড়ে আটটা পর্যন্ত ৯১ শতাংশ ভোট গণনা হয়েছে। তার মধ্যে সর্বোচ্চ ৫০ দশমিক ৪ শতাংশ ভোট পেয়েছেন মামদানি। তার প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ১০ লাখ ৩৬ হাজার ৫১।

মামদানির নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের সাবেক গভর্নর স্বতন্ত্র প্রার্থী অ্যান্ড কুমো পেয়েছেন ৪১.৬ শতাংশ ভোট। তার প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা ৮ লাখ ৫৪ হাজার ৯৯৫।

যুক্তরাষ্ট্রের সাম্প্রতিক বিভিন্ন নির্বাচনে ভোটের খরা চলছিল। বলা যায়, মামদানি তা ঘুছিয়ে দিয়েছেন। ১৯৬৯ সালের পর নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে এবারই প্রথমবারের মতো প্রায় ২০ লাখ ভোট পড়েছে। আর তখন থেকে প্রথম কোন প্রার্থী হিসেবে ১০ লাখের বেশি ভোট পেয়েছেন মামদানি। চার বছর আগে নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচনে ভোট পড়েছিল মাত্র ১১ লাখ।

বাজিমাত করেছেন মামদানি

দল-মত নির্বিশেষে ভোটারদের আস্থার প্রতিদান দিতে কাজ করার প্রত্যয় জানিয়েছেন মামদানি। বিজয় ভাষণে তিনি বলেছেন, 'আমি প্রতিদিন সকালে জেগে উঠব একটি লক্ষ্য নিয়ে: আপনাদের জন্য এই শহরটিকে আগের দিনের চেয়ে ভালো করে তুলব।'

নির্বাচনে যারা তাকে ভোট দেননি তাদের আস্থা অর্জনের চেষ্টা করবেন বলে জানিয়েছেন মামদানি। বলেছেন, 'আপনাদের আস্থাভাজন হয়ে উঠার যোগ্য হিসেবে আমাকে প্রমাণ করার সুযোগ দেওয়ার জন্য আপনাদের ধন্যবাদ।'

অনেক রেকর্ডের মালিক হবেন মামদানি

আগামী বছরের ১ জানুয়ারি মামদানি যখন নিউইয়র্কের মেয়র হিসেবে শপথ নিবেন, তখন তিনি হবেন এক শতকের মধ্যে এই পদে সবচেয়ে কম বয়সী ব্যক্তি। নিউইয়র্কের কুইন্স থেকে নির্বাচিত রাজ্য আইনসভার সদস্য মামদানি হবেন নিউইয়র্কের প্রথম মুসলমান মেয়র। শহরটির ৪০০ বছরের ইতিহাসে দক্ষিণ এশিয়া বংশোদ্ভূত প্রথম মেয়র হচ্ছেন তিনি। প্রথম দফায় নিউইয়র্ক এর মেয়র হওয়া এরিক অ্যাডামসের স্থলাভিষিক্ত হবেন তিনি। একের পর এক কেলেঙ্কারিতে জড়িয়ে জনসমর্থন হারানো অ্যাডামস এবার মেয়র নির্বাচনের দৌড় থেকে ছিটকে পড়েছেন।

৪ নভেম্বর রাতে যখন উৎফুল্ল সমর্থকদের সামনে মামদানি বক্তব্য দিচ্ছিলেন, সে সময় তার পাশে ছিলেন বাবা মাহমুদ মামদানি ও মা মীরা নায়ার। মাহমুদ মামদানির জন্ম ভারতের মুম্বাইয়ে। তিনি বেড়ে উঠেছে উগান্ডায়, সেখানে জন্ম জোহরান মামদানির। নৃবিজ্ঞানী মাহমুদ যুক্তরাষ্ট্রের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক। উগান্ডার কয়েকটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন তিনি।

মিরা নায়ার একজন জনপ্রিয় চলচ্চিত্র নির্মাতা। তিনি ভারতের আধুনিক সমাজে রূপান্তর ও দেশের বিশাল প্রবাসী জনগোষ্ঠীর পরিচয় সংক্রান্ত সংগ্রাম নিয়ে একাধিক আন্তর্জাতিক সফল চলচ্চিত্র তৈরি করেছেন। তার সর্বাধিক পরিচিত চলচ্চিত্র গুলোর মধ্যে রয়েছে- ডেনজেল ওয়াশিংটন অভিনীত মিসিসিপি মাসালা এবং ২০০১ সালের কমেডি ড্রামা মনসুন ওয়েডিং।

উগান্ডার রাজধানী কাম্পালায় ১৯৭১ সালে জন্মগ্রহণ করেন মামদানি। সাত বছর বয়সে যুক্তরাষ্ট্রে এসে পড়াশোনা করেন। মেইন অঙ্গরাজ্যের বোডোইন কলেজ থেকে আফ্রিকান স্টাডিজে স্নাতক করেন জোহরান মামদানি। রাজনীতিতে আসার আগে

আবাসন বিষয়ক পরামর্শক হিসেবে কাজ করেন। মূলত স্বল্প আয়ের পরিবারগুলোকে উচ্ছেদের হাত থেকে রক্ষায় কাজ করেন তিনি।

২০২০ সালে নিউইয়র্ক স্টেট অ্যাসেম্বলি নির্বাচনে কুইন্স থেকে নির্বাচিত হন। এবছরের শুরুর দিকে নিউইয়র্কের ব্রুকলিনে বসবাস করা সিরিয়ান চিত্রশিল্পী রামা দুয়াজিকে বিয়ে করেন। দ্যা নিউ ইয়র্কার, দ্যা ওয়াশিংটন পোস্ট এর মত বিখ্যাত বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমে তার কাজ প্রকাশিত হয়েছে।

আশাবাদের জয়

জোহরান মামদানির জয় যুক্তরাজ্যের রাজনীতিতেও মনোযোগ কেড়েছে। লন্ডনের মেয়র সাদিক খান দু'জনের মধ্যে মিল খুঁজে পেয়েছেন। বলেছেন, 'নিউইয়র্কের বাসিন্দাদের সামনে আশা ও আতঙ্ক এই দু'টির একটিকে বেছে নেওয়ার স্পষ্ট সুযোগ ছিল এবং আমরা যেমনটি লণ্ডনে দেখেছি আশা বিজয়ী হয়েছে।' যুক্তরাজ্যের স্বাস্থ্য মন্ত্রীও মামদানির জয় নিয়ে প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

যুক্তরাজ্যের গ্রীন পার্টির নেতা জ্যাক পোলানস্কি বলেছেন, তিনিও মামদানির মতো বৈষম্যের বিরুদ্ধে অবস্থান নেবেন।

নিউইয়র্ক হবে আলোকবর্তিকা

আশার বার্তা দিয়ে বিজয়ী ভাষণে জনতার উদ্দেশ্যে জোহরান মামদানি বলেছেন, রাজনৈতিক অন্ধকারের এই সময়ে নিউইয়র্ক হবে 'আলোকবর্তিকা'।

অভিবাসীসহ সবার জন্য কাজ করার ঘোষণা দিয়েছেন মামদানি। ইহুদি সম্প্রদায়ের যেসব সদস্য ইহুদি বিদ্বেষের শিকার হয়েছেন, তাদেরও পাশে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন তিনি।

প্রথম মুসলমান হিসেবে যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বড় শহর নিউইয়র্কের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন জোহরান মামদানি। তরুণ ও স্বল্প আয়ের ভোটারদের অকুণ্ঠ সমর্থন নিয়ে বিজয়ী হওয়া মামদানি শত বছরের মধ্যে নিউইয়র্কের সবচেয়ে কম বয়সী মেয়র হয়েছেন। আর এই জয় বিশ্বজুড়ে সাড়া ফেলেছে।

সদ্য ৩৪ এ পা দিয়েছেন। ভারতীয় পিতা-মাতার সন্তান, গায়ের রং বাদামী, ধর্মে মুসলিম এবং রাজনীতিতে ঘোর বামপন্থী। এটা এমন এক ঘটনা যা রূপকথাকেও হার মানায়।

হ্যাঁ আমি বয়সে নবীন। আমি মুসলিম এবং আমি একজন ডেমোক্রেটিক সোশ্যালিস্ট। সবচেয়ে বড় কথা, এর কোনটার জন্যই আমি লজ্জিত নই। গত ৪ নভেম্বর মঙ্গলবার রাতে নিউইয়র্ক সময় ব্রুকলিনে তার বিজয় ভাষণে কয়েক হাজার উৎফুল্ল সমর্থকদের প্রতি সহাস্যে একথা বলেন মামদানি। উপস্থিত দর্শকদের অধিকাংশই তার মত নবীণ ও অভিবাসী, যাদের ভোটে এমন অসম্ভব বিজয় সম্ভব হয়েছে। তরুণ প্রজন্মের সদস্যদের নির্বাচনী রাজনীতিতে অংশগ্রহণের এমন নজির এই শহর আগে কখনো দেখেনি। সেসব স্বেচ্ছাসেবকদের দিকে তাকিয়ে মামদানি বলেন, এই বিজয় আমার একার নয়, এই বিজয় এই শহরের বহুভাষী, বহু ধর্মের, বহু সংস্কৃতির মানুষের, যাদের প্রত্যেকের পরিচয় অভিভাসী হিসেবে। নিউইয়র্ক আগে যেমন ছিল এখনো তেমনি অভিবাসীদের শহর। শুধু নতুন হচ্ছে এই যে, এখন থেকে এই শহরের নেতৃত্বে থাকবে এক

অভিবাসী। এই বিজয়কে নিজের প্রগতিশীল কর্মসূচির পক্ষে একটি স্পষ্ট ম্যান্ডেট হিসেবে দাবি করেন মামদানি। শহরের দরিদ্রতম জনগোষ্ঠীকে টেনে তুলতে নিজ কর্মসূচি বাস্তবায়নে গণপ্রশাসনকে ব্যবহার করতে তিনি বদ্ধপরিকর। বিজয় ভাষণে তিনি বলেন, আমরা প্রমাণ করব যে, 'এমন কোন সমস্যা নেই যা সরকার সমাধান করতে পারে না। এমন কোন উদ্যোগ নেই, যা সরকার গুরুত্ব দিয়ে দেখবে না।'

মামদানির প্রচারণার কেন্দ্রে যে অর্থনৈতিক কর্মসূচি তার মূল লক্ষ্য নিউইয়র্ক শহরকে সাধারণ কর্মজীবীদের জন্য অধিক বসবাসযোগ্য করে তোলা। সাধারণ নিউইয়র্কবাসীর জীবন যাত্রার মান উন্নয়নে এই নিবিড় মনোযোগই মামদানিকে বিজয়ে সাহায্য করেছে। যে কর্মসূচির প্রস্তাব মামদানি করেছেন, তার মধ্যে রয়েছে সরকারি অনুদানে নির্মিত বাড়ি ভাড়া চার বছরের জন্য বাড়তে না দেওয়া, স্বল্প আয়ের মানুষের জন্য নতুন ২ লাখ অ্যাপার্টমেন্ট নির্মাণ, সবার জন্য শিশু পরিচর্যা নিশ্চিত করা ও বিনা ভাড়ায় বাসের ব্যবস্থা। তিনি সরকারি ব্যবস্থাপনায় সবজি ও নিত্য ব্যবহার দ্রব্যের সরবরাহের প্রতিশ্রুতিও দিয়েছেন। এই উচ্চবিলাসী কর্মসূচির জন্য যে অতিরিক্ত অর্থের প্রয়োজন তা সংগ্রহের মামদানি শহরের অতি ধনী ও কর্পোরেট ব্যবসায়ের উপর অতিরিক্ত কর আরোপের কথা বলেছেন।

বিজয় ভাষণে তিনি নিজেই স্বীকার করেন, সবাই অনেক আশা নিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমরা সে আশা পূরণে প্রস্তুত। সাবেক গভর্নর মারিও কুমো এক সময় বলেছিলেন, রাজনৈতিক ক্যাম্পেইন করতে চাই কবিতা, কিন্তু প্রশাসনে সফল হতে হলে চাই গদ্য। সে কথা উদ্বৃত্ত করে মামদানি বলেন, 'আমরা গদ্যই লিখব কিন্তু তা লিখা হবে ছন্দে।'

যে কথা আমরা সমস্বরে বলেছি, যে স্বপ্ন আমরা যৌথভাবে দেখেছি, সেটাই হবে আমাদের কর্মসূচি, আর তা আমরা বাস্তবায়িত করব সম্মিলিতভাবে। এই শক্তি আপনাদের, এই শহর আপনাদের। বলেছেন মামদানি।

তরুণ মামদানি নিজে স্বপ্ন দেখেছেন, স্বপ্ন দেখাচ্ছেন নিউইয়র্ক শহরের ৮৫ লাখ মানুষকে। নিউইয়র্ক শহরের মেয়র নির্বাচনে জোহরান মামদানির যাত্রাটা শুরু হয়েছিল গত বছর। তখন তার না ছিল পরিচিতি, না ছিল খুব বেশি তহবিল, না ছিল ততটা দলীয় সমর্থন। এত সীমাবদ্ধতার পরও জনপ্রিয়তার চূঁড়ায় উঠেছেন মামদানি। তার তারুণ্য ও অনন্য সাধারণ চরিত্র ভোটারদের আকৃষ্ট করেছে। এই জনপ্রিয়তায় ভর করে নিউইয়র্কের প্রথম মুসলিম মেয়র হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন তিনি।

মামদানি নিজের পরিচয় দেন গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্রী হিসেবে। তার পরিচয়ে সমাজতন্ত্রী শব্দটা নিয়ে অনেকের উষ্মা আছে। তবুও নির্বাচনী লড়াইয়ে পিছু হটেননি মামদানি। বরং গর্বের সঙ্গে বামপন্থী বিষয়গুলোকে সমর্থন করেছেন। যেমন- শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা, গণপরিবহন ব্যবস্থার সম্প্রসারণ এবং মুক্তবাজার ব্যবস্থার সরকারি হস্তক্ষেপ। নির্বাচনের পরও এই পরিচয় মামদানির জন্য চ্যালেঞ্জ হতে পারে বলে সতর্ক করেছেন সমালোচকরা। উদাহরণ হিসেবে বলা চলে, ১২ বছর আগে মেয়র পদে বসা ডেমোক্র্যাট বিল ডি ব্লাসিওর কথা। নিউইয়র্কের অর্থনীতি ও সামাজিক বৈষম্য নিয়ে

সোচ্চার হয়ে নির্বাচনে জয় পেয়েছিলেন তিনি। মামদানির মত ব্লাসিওর উপরেও বামপন্থীদের আশা ছিল, তিনি উদার শাসনব্যবস্থার উদাহরণ সৃষ্টি করবেন।

তবে আট বছর পর ব্লাসিওকে মেয়র এর কার্যালয় ত্যাগ করতে হয়েছিল সফলতা, ব্যর্থতা ও হতাশার মিশ্র এক অভিজ্ঞতা নিয়ে। মেয়রের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতাগুলো তার নতুন অনেক নীতি বাস্তবায়নের পথে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। ব্লাসিওর মতো মামদানির প্রতিও এখন নিউইয়র্কবাসীর একই ধরনের আশাবাদ থাকবে। তাই সফল মেয়র হতে নানা সীমাবদ্ধতা পেরোনোর চেষ্টা করতে হবে মামদানিকে।

এছাড়া মামদানি যে উচ্চাকাঙ্ক্ষী লক্ষ্য নিয়ে মেয়র হিসেবে যাত্রা শুরু করতে যাচ্ছেন, তা বাস্তবায়নের তহবিল জোগাড় করাও কষ্টসাধ্য হবে। কারণ এই তহবিল গড়তে যে ধরনের কর বৃদ্ধির প্রয়োজন, তার বিরোধিতা করেন নিউইয়র্কের গভর্ণর ও আরেক ডেমোক্র্যাট ক্যাথি হোকুল। আর মামদানি যদি যথেষ্ট তহবিলও পান তাহলে এককভাবে তার নির্বাচনী প্রতিশ্রুতিগুলো পূরণ করা সম্ভব নয়।

নির্বাচনের প্রচারে নিউইয়র্কের বিভিন্ন বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান ও অভিজাত শ্রেণীর কড়া সমালোচনা করেছিলেন মামদানি। এই ব্যবসা ও অভিজাতদের কারণেই নিউইয়র্কের ম্যানহাটান বিশ্বের অর্থনৈতিক রাজধানী হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। তাই মেয়র এর কাজ কার্যকর ভাবে করতে হলে মামদানিকে অবশ্যই তাদের স্বার্থ রক্ষায় কিছুটা হলেও ছাড় দিতে হবে। মামদানির নির্বাচনী প্রচারে ছিল গাজায় ইসরাইলের আগ্রাসনের বিরোধিতা। নিউইয়র্কে পা রাখলে ইসরাইলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহুকে গ্রেফতার করবেন বলে প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন। এখন মেয়র হিসেবে নিজের মেয়াদের কোন না কোন সময় এই প্রতিশ্রুতি নিয়ে মামদানিকে পরীক্ষার মুখে পড়তে হতে পারে।

এখন পর্যন্ত মামদানির প্রতিভা-ই তাকে আজকের উচ্চতায় এনেছে। এখন দেখার পালা সামনের বছরগুলোয় এই প্রতিভা কাজে লাগিয়ে প্রতিকূলতাগুলো কতটা সামাল দিতে পারেন তিনি।

মামদানি জেতার পর তার সমর্থকরা নেচে গেয়ে উল্লাস করে। সমর্থকদের বেশিরভাগ ছিল কম বয়সী। তবে তিনি বয়স্কদের ভোটও পেয়েছেন। এর প্রমাণ একজন বয়স্ক মহিলা কালো তার জয়ে আনন্দ করেছেন। অপেক্ষাকৃত কম বয়সীদের ভোট তো ছিলই। মামদানি পরাজিত করেছেন অ্যান্ড কুমোকে। নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একাধিকবার বন্যা এবং দাবানলের শিকার হয়েছে। সম্প্রতি অভূতপূর্ব শাট ডাউন এর পরিপ্রেক্ষিতে বিমান চলাচলে বিপর্যয়, বিমান বন্দরের শতকরা ১০ ভাগ বন্ধ, শত শত ফ্লাইট বাতিলের ঘটনা ঘটেছে। মামদানি এবং কুমো উভয়ের নির্বাচনী ওয়াদা ছিল জীবনযাত্রার ব্যয় বৃদ্ধি রোধ করা। মানদানি কিভাবে তার ওয়াদা রক্ষা করবে তা এখন দেখার বিষয়। ■

প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন-১ ঃ কোন ব্যক্তি মাগরিবের নামায জামা'আতে গিয়ে শেষ রাক'আত পেল, ইমামের সালামের পর সে তার বাকী রাক'আতগুলো কিভাবে পড়বে জানালে উপকৃত হব?

মঞ্জুরুল আলম, বড়ুরা, কুমল্লিা

উত্তর ঃ যে মাসবুক শেষ রাক'আতে জামা'আতে শরীক হয়েছেন তিনি ইমামের সালাম ফিরানোর পর অবশিষ্ট নামায আদায়ের জন্য দাঁড়িয়ে যাবেন। এটা হবে মাসবুকের কির'আতের দিক থেকে প্রথম রাক'আত এবং তাশাহুদের দিক থেকে দ্বিতীয় রাক'আত। কাজেই তিনি এই রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে সূরা মিলাবেন এবং এই রাক'আত শেষ করে তাশাহুদের জন্য বসবেন। তাশাহুদ শেষ করে পরবর্তী রাক'আতের জন্য দাঁড়াবেন। এটা হবে তাঁর কিরাআতের দিক থেকে দ্বিতীয় এবং তাশাহুদের দিক থেকে তৃতীয় রাক'আত। এই রাক'আতেও সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাবেন এবং রাক'আত শেষ করে (মাগরিবের নামায হলে) তাশাহুদের জন্য বসে তাশাহুদ, দরূদ ও দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবেন। মাগরিব ব্যতীত চার রাক'আত বিশিষ্ট অন্য কোন নামায– যুহর, আসর বা ঈশা– হলে তৃতীয় রাক'আতের পর সরাসরি চতুর্থ রাক'আতের জন্য দাঁড়িয়ে যাবেন। এটা হবে তাঁর কিরাআতের দিক থেকে তৃতীয় এবং তাশাহুদের দিক থেকে চতুর্থ রাক'আত। এই রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে কোন সূরা মিলাবেন না এবং এই রাক'আত শেষ করে বসে তাশাহুদ, দরূদ ও দু'আ মাসূরা পড়ে সালাম ফিরিয়ে নামায শেষ করবেন।

প্রশ্ন-২ ঃ (ক) এক ব্যক্তির মোট যাকাতের পরিমাণ হল ৯০০০ টাকা। টাকাগুলো তার একজন রক্ত সম্পর্কের আত্মীয়ের প্রয়োজনের সময় দেয়ার জন্য এখন তার নিজের কাছে জমা রাখা যাবে কি না?

(খ) একাধিক বছরের যাকাত এক সাথে দেয়া যাবে কিনা?

(গ) আমরা জানি ইসলামী বিধিনিষেধ আছে যে, মহিলারা যেন পুরুষের ড্রেস না পরে এবং পুরুষরাও মহিলাদের ড্রেস না পরে। আমার জানার বিষয় হল, মহিলারা বোরকা পরিধান করে পুরুষের প্যান্ট-শার্ট পরতে পারবে কি?

সায়মা আক্তার, মিরপুর, ঢাকা

উত্তর ঃ (ক) মাতা-পিতা ও তাদের সরাসরি উর্ধ্বতন পুরুষ-মহিলা যেমন ঃ দাদা-দাদী, নানা-নানী প্রভৃতি এবং ছেলে-মেয়ে ও তাদের সরাসরি অধস্তনদেরকে যাকাত দেয়া জায়েয নেই। এছাড়া যে কোন নিকট বা দূর আত্মীয়কে যাকাত দেয়া জায়েয হবে।

যাকাতের টাকা যাকাতের হকদারের নিকট হস্তান্তর না করা পর্যন্ত যাকাত আদায় হবে না।

(খ) যাকাত যখন ফরয হয় তখনই আদায় করা উচিত। যাকাত আদায়ে বিলম্ব করা উচিত নয়। কারণ এতে যাকাত অনাদায় থেকে যাওয়ার আশংকা থাকে। প্রয়োজনে ধার করে হলেও সময় মতো যাকাত আদায় করা প্রয়োজন।

(গ) মহিলাদের পুরুষের পোশাক পরা নিষেধ। সে বোরকা পরা অবস্থায় পরুক কিংবা বোরকা ছাড়াই পরুক সকল ক্ষেত্রে এ নিষেধাজ্ঞা প্রযোজ্য।

প্রশ্ন-৩ ঃ বলা হয় ধুমাপানে বিষপান। ধুমপান স্বাস্থ্যের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। আমার দৃষ্টিতে এটি কুরুচিপূর্ণ ও গর্হিত কাজ। প্রশ্ন হল- ধুমপায়ী মাসজিদের ইমামদের পিছনে নামায আদায় করলে তা শুদ্ধ হবে কিনা জানালে উপকৃত হব।

মোহাম্মদ সাইদুল হক, খুলনা

উত্তর ঃ আপনি লিখেছেন ধুমপান একটি কু-রুচিপূর্ণ ও গর্হিত কাজ। আরব বিশ্বের বড় বড় উলামায়ে কিরাম ধুমপানকে হারাম বলেছেন। তাঁদের এ ফাতওয়ার পক্ষে তাঁরা কুরআন ও হাদীসের বহু দলীল এনেছেন। মাসিক পৃথিবীতে আমরা একই বিষয়ে আগেও বিস্তারিত লিখেছি।

ধুমপান যারা করে তাদের মুখ থেকে মারাত্মক দুর্গন্ধ বের হয়। অনেক ধুমপায়ীর সাথে কথা বলতে গেলে এমনকি তাদের পাশে নামাযে দাঁড়ালে তাদের মুখের দুর্গন্ধে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে এমনকি বমিরও উদ্রেক হয়। পিঁয়াজ ও রসুন হালাল খাদ্য। কাঁচা পিঁয়াজ ও রসুন খেলে মুখে দুর্গন্ধ হয়। কাঁচা পিঁয়াজ ও রসুন খেয়ে মাসজিদে আসলে মুসল্লী ও ফেরেশতাগণ কষ্ট পাবে; এ জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁচা পিঁয়াজ ও রসুন খেয়ে মাসজিদে যেতে নিষেধ করেছেন। এমতাবস্থায় ধুমপানের মতো কু-রুচিপূর্ণ, ঘৃণিত ও গর্হিত কাজে অভ্যস্ত লোকদের মাসজিদের ইমাম নিযুক্ত করা স্বাভাবিক নয়। তা ছাড়া বহু উলামায়ে কিরাম ধুমপানকে হারাম বলেছেন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ধুমপানকে বিষপান বলে অভিহিত করেছে যা ধুমপান হারাম হওয়া সংক্রান্ত উলামায়ে কিরামের ফাতওয়াকে আরো সুদৃঢ় করেছে। অপরদিকে ধুমপায়ীদেরকে সাধারণ মুসল্লীগণ অপছন্দ করেন। একজন ধুমপায়ী মাসজিদের ইমাম হবে এটা মুসল্লীগণ আদৌ পছন্দ করে না এবং মেনে নেয় না। হাদীসে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন, তিন প্রকার লোকের নামায কবুল হয় না। এক প্রকার হলো, সেই লোক যে লোকদের নামাযের ইমামত করে অথচ লোকেরা তাকে পছন্দ করে না (আবু দাউদ)। অতএব ধুমপায়ী লোকদেরকে মাসজিদের ইমাম হিসেবে নিযুক্ত করা থেকে বিরত থাকা অপরিহার্য।

প্রশ্ন-৪ ঃ বাংলাদেশে অনেক আলিম-উলামা ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থা কায়েমের পক্ষে কাজ করেননা বরং প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে বিরুদ্ধে অবস্থান করেন, এ ব্যাপারে শারী'আতের ফায়সালা কি সবিনয়ে জানতে চাই।

মোহাম্মদ শাহাবুদ্দিন, ঢাকা

উত্তর ঃ আল্লাহতা'আলা পবিত্র কুরআনে দীন কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

شَرَعَ لَكُمْ مِّنَ الدِّيْنِ مَا وَصّٰى بِهٖ نُوْحًا وَّ الَّذِيْٓ اَوْحَيْنَآ اِلَيْكَ وَ مَا وَصَّيْنَا بِهٖٓ اِبْرٰهِيْمَ وَ مُوْسٰى وَ عِيْسٰٓى اَنْ اَقِيْمُوا الدِّيْنَ وَ لَا تَتَفَرَّقُوْا فِيْهِ –

অর্থঃ তিনি (আল্লাহ) তোমাদের জন্য দীন বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন : যে বিষয়ে তিনি নূহকে নির্দেশ দিয়েছিলেন, আর আমি তোমার কাছে যে ওহী পাঠিয়েছি এবং ইবরাহীম, মূসা ও ঈসাকে যে নির্দেশ দিয়েছিলাম তাহলো, তোমরা দীন কায়েম করো এবং এতে (দীন কায়েম করার ব্যাপারে) অনৈক্য সৃষ্টি করোনা। (সূরা আশ শূরা-১৩)

উপর্যুক্ত আয়াতে আল্লাহতা'আলা সর্বশেষ নবী ও রাসূল মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সহ বড় বড় ও জলীল কদর কয়েকজন নবী ও রাসূলের নাম উল্লেখ করে তাঁদেরকে দীন কায়েম করার নির্দেশ দিয়েছেন। সেই সাথে একাজে অনৈক্য সৃষ্টি না করারও নির্দেশ দিয়েছেন। এ থেকে প্রতিয়মান হয় যে, দীন কায়েম করার কাজটি ছোট-খাট, অগুরুত্বপূর্ণ কিংবা অবহেলা করার মত কোনো কাজ নয় এবং এটি কোনো ইখতিলাফী বিষয়ও নয়। বরং এটি আল্লাহ তা'আলার একটি শ্বাশ্বত বিধান। কাজেই দল-মত, ভাষা-বর্ণ, আলিম গায়রে আলিম নির্বিশেষে সারা দুনিয়ার সকল মুসলিমদের ঐক্যবদ্ধভাবে দীন কায়েমের কাজ করা ফরয। একাজে ইখতিলাফ করা বা বিরোধিতা করার কোনো সুযোগ নেই। কেননা এটা কোনো দলমত, গোষ্ঠী গোত্র বা কোনো সম্প্রদায়ের নিজস্ব কোনো কাজ নয় বরং এটা ঈমানী দায়িত্ব হিসেবে সকল মুসলিমদের নিজেরই কাজ। কারো এ কাজের বিরোধিতা করার অর্থ দাঁড়ায় তিনি নিজেই নিজেরই কাজের এবং নিজেরই ঈমানী দায়িত্বের বিরোধিতা করলেন। আর এর মাধ্যমে তিনি নিজেই নিজেকে ইহকাল ও পরকালে ক্ষতিগ্রস্ত করলেন। এটা কারো জন্য বুদ্ধিমানের কাজ নয়। কারণ সবাইকে মরতে হবে, পৃথিবীতে কেউ অমর নয়। হাশরে সবাইকে আল্লাহর কাছে ফিরে যেতে হবে, পালিয়ে থাকার কোনো সুযোগ থাকবে না। সবাইকে দুনিয়ার সারা জীবনের যাবতীয় কাজের তন্ন তন্ন হিসাব দিতে হবে, যাররা পরিমাণ ফাঁকি দিয়ে বেঁচে যাওয়ার কোনো সুযোগ কেউ পাবেনা। কেউ পরকাল বিশ্বাস করুন আর না-ই করুন পরকালে তাকে অবশ্যই অবশ্যই উঠতেই হবে। বুকে হাত দিয়ে অন্তরের কাছে জানতে চান আপনি ঠিক পথে আছেন না ভুল পথে আছেন। আপনার অন্তরই আপনাকে বলে দেবে। আল্লাহতা'আলা সকল মুসলিমকে তাঁর দীন জানার, বুঝার এবং তাঁর দীন কায়েম তথা দীন মুতাবিক জীবন গড়ে ইহকাল ও পরকালে সফলকাম করুন।

প্রশ্ন-৫ ঃ সফরে থাকা অবস্থায় যদি কেহ কোনো কারণে নামায কাযা করে এবং সফর শেষে একসাথে সব কাযা নামায পড়ার বা আদায় করার কোন শারী'আতী সুযোগ আছে কি?

মাহমুদুর রহমান
ঝিনাইদহ

উত্তর ঃ মুসাফির হোক বা মুকিম হোক কোনো অবস্থায়ই নামায কাযা করার সুযোগ নেই। নিতান্তই কোনো কারণে যদি কেউ এক বা একাধিক ওয়াক্ত নামায আদায় করতে না পারে তাহলে সে ওযর চলে যাওয়ার সাথে সাথে তা আদায় করে নেবে। এমন ঘটনা কারো যদি সফরে হয় এবং সফরে আদায় করার যদি সুযোগ না পায় তাহলে সফর শেষে সুযোগ পাওয়া মাত্রই একই সাথে তারতীব অনুযায়ী বাদপড়া নামায আদায় করে নিতে হবে।

• ফাতওয়া বিভাগ, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

বই পরিচিতি

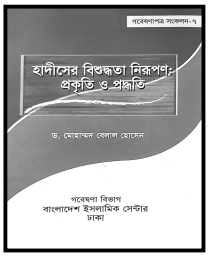

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান মুমিন

বইয়ের নাম : **হাদীসের বিশুদ্ধতা নিরূপণ : প্রকৃতি ও পদ্ধতি**

লেখক : **ড. মোহাম্মদ বেলাল হোসেন**

পৃষ্ঠা : ২০৮

প্রকাশক : বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা।

বইটি মূলত হাদিস বিজ্ঞান (ইলমুল হাদীস) এর একটি শাখা। উসূলুল হাদিস (হাদিস যাচাই-বাছাই এর মূলনীতি) সংক্রান্ত। যারা নিয়মিত কোরআন-হাদিস অধ্যয়ন করেন তাদের জন্য এই বইটিও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কোরআনের গভীরে প্রবেশ করতে যেমন উলুমুল কুরআন (কোরআন বিষয়ক বিজ্ঞান) বিষয়ে জ্ঞানের প্রয়োজন, তেমনিভাবে হাদিসের গভীরে প্রবেশের জন্যও উলুমুল হাদিস বা হাদিস বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞানার্জন অবশ্যক। বইটিতে হাদিস বিষয়ক মৌলিক কিছু নীতিমালা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

বইটি পাঠে আমরা জানতে পারি - হাদিসের সংজ্ঞা, ওহী ও হাদিসের পার্থক্য, কোরআন ও হাদিসের মধ্যে পার্থক্য, হাদিসের গুরুত্ব ও প্রামাণিকতা, হাদিস সংরক্ষণ ও সংকলন, হাদিসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে অনুষ্ঠিত নীতিমালা, হাদিস সম্পর্কে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এবং আধুনিক কতিপয় লেখকের ভ্রান্ত ধারণার অপনোদন। যারা হাদিসের বিশুদ্ধতা নিরূপণে কাজ করেছেন তাদের কয়েকজন খ্যাতিমান মুহাদ্দিসের পরিচয় ও কর্মনীতি নিয়েও আলোচনা করা হয়েছে এ বইটিতে।

ড. মুহাম্মদ বেলাল হোসেন সম্পর্কে অগ্রসর পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দেয়ার খুব একটি প্রয়োজন নেই। তবুও বলছি, তিনি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। লেখক-গবেষক যে কজন ইসলামিক স্কলার বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা এর সাথে জড়িত তিনি তাদের অন্যতম ও গুরুত্বপূর্ণ অনেক গ্রন্থের লেখক।

যেসব প্রতিষ্ঠান মানসম্পন্ন ও নির্ভরযোগ্য ইসলামিক বই প্রকাশ করে থাকে বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা তার অন্যতম। মানসম্পন্ন নির্ভরযোগ্য বই মানেই বিআইসি'র বই। যে কোন মান বিচারই হোক বিআইসি নির্ভরযোগ্য ইসলামী বই প্রকাশনায় প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে।

এই বইটি প্রকাশের আগেও ইসলামিক স্কলারদের দিয়ে স্টাডি সেশনের মাধ্যমে পর্যালোচনা করা হয়েছে। যারা অংশগ্রহণ করেছেন তারা হলেন, অধ্যাপক আ.ন.ম. রফিকুর রহমান মাদানী, ড. হাসান মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন, অধ্যক্ষ এ.কিউ.এম আবদুল হাকিম মাদানী, মুফতি মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান, ড. মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ, ড. মতিউল ইসলাম মাদানী, ড. মুহাম্মদ নজীবুর রহমান, ড. মুহাম্মদ আব্দুল কাদের, মাওলানা মুহাম্মদ আব্দুর রহমান, মাওলানা খলিলুর রহমান মাদানী, মাওলানা খলিলুর রহমান মুমিন, ড. আহমদ আলী, ড. নজরুল ইসলাম খান, ড. যুবাইর মোহাম্মদ এহসানুল হক, মাওলানা নাজমুল ইসলাম, মুহাদ্দিস ইমদাদুল্লাহ, ড. শফিউল আলম ভুঁইয়া প্রমুখ। ■